আহমদীয়াতের পয়গাম

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলিফা ও মুসলেহ মাওউদ
হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)-এর উর্দূ ভাষণ
'পয়গামে আহমদীয়াত'-এর বাংলা ভাবানুবাদ

পুস্তকের নাম	ঃ	আহ্মদীয়াতের পয়গাম
Name Of Book	ঃ	Ahmadiyyater Paigam
লেখক	ঃ	হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)
Author	ঃ	Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad, Khalifatul Masih II [RA]
অনুবাদক	ঃ	মৌলবী আব্দুল হাফেয মরহুম
Translated By	ঃ	Moulvi Abdul Hafiz Morhum
বর্তমান সংস্করণ	ঃ	ফেব্রুয়ারী ২০২০ (বাংলা)
Present Edition	ঃ	February 2020 (Bengali)
সংখ্যা	ঃ	৫০০
Copies	ঃ	500
প্রকাশক	ঃ	নাযারত নশর ও এশায়াত; সদর আঞ্জুমান আহ্মদীয়া, কাদিয়ান, গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব
Published by	ঃ	Nazarat Nashr-o-Ishaat,Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian,Gurdaspur,Punjab
মূদ্রণে	ঃ	ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস,কাদিয়ান, গুরুদাসপুর,পাঞ্জাব
Printed at	ঃ	Fazle Umar Printing Press, Qadian, Gurdaspur,Punjab-143516

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে এ যুগে আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তই হচ্ছে একমাত্র জামাত যা প্রকৃত ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে আজ বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রসার এবং প্রচার কার্যে নিয়োজিত। আহ্মদীয়াতের বিরোধিতাকরীরা সরলমনা মুসলমানদের আহ্মদীদের ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। অতএব জামা'ত আহ্মদীয়ার ধর্ম-বিশ্বাস এবং শিক্ষাবলী সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ রূপে অবগত হওয়া দরকার। তবেই আমরা অন্যদের সম্মুখে প্রকৃত ইসলামের বার্তা উত্তমরূপে তুলে ধরতে সক্ষম হব।

হজরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) র দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশিরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ আল মুসলেহুল মাওউদ(রা.) **"আহ্মদীয়াত কা পয়গাম"** শিরোনামে এই পুস্তিকাটি ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেছিলেন। যার মধ্যে আহমদীয়াত সম্পর্কে এই মৌলিক প্রশ্ন যে 'আহ্মদীয়াত কি এবং এর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যাবলী কি?' খুবই বোধগম্য ভাষায় সহজ ভাবে জামাত আহমদীয়ার ধর্ম বিশ্বাস এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। হুজুর (রাঃ) আরও বলেন যে আহ্মদীয়াত কোনও নুতন ধর্ম নয় আর না আহ্মদীদের স্বতন্ত্র কোনও 'কলেমা' আছে। এছাড়া খতমে নবুওয়াত, নাজাত, আহাদীস, তকদীর, জেহাদ ইত্যাদি বিষয়েও জামা'ত আহ্মদীয়ার দৃষ্টিভঙ্গি পুস্তিকাটিতে তুলে ধরা হয়েছে। যা নিষ্ঠাবান সত্যান্বেষনকারী মুসলমানদের আহমদীয়াতের উদ্দেশ্যাবলীকে অনুধাবন করে প্রকৃত সত্য অবধি পৌঁছাতে সহায়ক সাব্যস্ত হবে। পুস্তিকাটির অনুবাদ করেছেন মোহতরম আব্দুল হাফিজ মরহুম। এবং অনুবাদটি বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। পরবর্তিতে এর বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

পুস্তিকাটি নতন আঙ্গিকে কম্পোজিং করেছেন মোকাররমা বুশরা হামিদ সাহেবা এবং সেটিং করেছেন মোকাররম জাহিরুল হাসান সাহেব সাহেব। পুস্তিকাটির পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছেন মোকাররম জাহিরুল হাসান সাহেব ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান, মোকাররম আবুতাহের মণ্ডল সাহেব সদর রিভিউ কমিটি বাংলা এবং মোকাররম শেখ মহম্মদ আলী সাহেব সদর এশায়া'ত কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ। প্রুফ দেখে সহযোগিতা করেছেন মোহতারেমা সাজিদা খাতুন সাহেবা।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) এর অনুমোদনে প্রথমবার পুস্তিকাটির বাংলা সংস্করণ কাদিয়ান থেকে প্রকাশ হচ্ছে। পুস্তিকাটি প্রকাশে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে আল্লাহ্তা'লা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং ইহার মুদ্রণ সর্বদিক থেকে কল্যাণময় করুন। আমীন।

ফেব্রুয়ারী ২০২০
কাদিয়ান

হাফিয মখদুম শরীফ
নাযির নশর ও এশায়া'ত কাদিয়ান

মুখবন্ধ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলিফা ও মুসলেহ মাওউদ হযরত মির্যা বশিরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) ২৭ অক্টোবর ১৯৪৮ সালে 'পয়গামে আহমদীয়াত' নামে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এটা ৬ নভেম্বর ১৯৪৮ সালে প্রথম আল ফযল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে। আহমদীয়া জামা'তের পরিচিতির এটি একটি মূল্যবান গ্রন্থ। তাই এর গুরুত্ব অনুধাবন করে মোহতরম আব্দুল হাফিজ মরহুম এর বঙ্গানুবাদ করেন। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৭, তৃতীয় ১৯৬৪, চতুর্থ ১৯৬৫, অষ্টম ১৯৯৬ এবং সর্বশেষ দশম সংস্করণ ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়।

বর্তমানে এর একাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। এ পুস্তকটি বঙ্গানুবাদ এবং অতীত ও বর্তমানে প্রকাশনায় যারা যেভাবে কাজ করেছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমিন,

সুম্মা আমিন।

মোবাশশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ

সূচীপত্র

1। আহ্‌মদীয়াত কি?.................................6
2। আহ্‌মদীয়াত কোন নূতন ধর্ম নহে...............6
3। আহ্‌মদীদের সম্বন্ধে কতকগুলি সন্দেহের নিরসন খতমে নবুয়ত..........................11
4। সমগ্র কুরআনে ঈমান...........................12
5। ফিরিশ্‌তার প্রতি ঈমান..........................12
6। মোজেযা..14
7। নাজাত...................................... ...14
8। হাদীস ও ফেকাহ্‌................................16
9। তকদীর..18
10। জেহাদ...18
11। স্বতন্ত্র জামাত কেন?............................20
12। আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রোগ্রাম.........27
13। আহ্‌মদীগণকে অপর সকল হইতে পৃথক রাখিবার কারণ 29

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আউযুবিল্লাহি মিনাশ্‌ শায়তানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি ‘আলা রাসূলিহিল্‌ কারীম।
খোদা কে ফযল অওর রহম কে সাথ।
হুআন্‌ নাসের।

আহমদীয়াতের পয়গাম

আহমদীয়াত কি? ইহার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই বা কি? জানা ও না-জানা অনেকের মনে এই প্রশ্ন উঠে। যাহারা জানেন, তাহারা গভীরভাবে জানিতে চান। যাহারা জানেন না, তাহাদের প্রশ্ন তো একান্ত ভাসা ভাসা ধরণের হইয়া থাকে। তাহারা শোনা কথা বিশ্বাস করেন অথবা কল্পিত ধারণা পোষণ করেন। যাহারা না জানার জন্য আহমদীয়াত সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, প্রথমে আমি তাহাদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি কথা বলিব ঃ

আহমদীয়াত কোন নূতন ধর্ম নহে

অনভিজ্ঞগণের মধ্যে অনেকে মনে করে, আহমদীয়াত একটি নূতন ধর্ম ; আহমদীগণ কলেমা-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

পড়ে না। কোন কোন লোকের ভ্রান্ত প্রচারণার ফলে অজ্ঞ লোকেরা এই বিশ্বাস পোষণ করে। মনে করে যে, প্রত্যেক ধর্মেরই ‘কলেমা’ থাকা চাই। সুতরাং তাহারা মনে করে, যেহেতু আহমদীয়াত একটি ধর্ম, উহারও একটি স্বতন্ত্র কলেমা আছে ; সত্য কথা এই যে আহমদীয়াত কোন নূতন ধর্ম নহে এবং প্রত্যেক ধর্মেরই ‘কলেমা’ থাকে না। ইসলাম ব্যতীত আর কোন ধর্মেরই ‘কলেমা’ নাই। ইসলামের ধর্মগ্রন্থ যেমন ইসলামের একটা বৈশিষ্ট্য, ইসলামের নবী যেমন ইসলামের আর একটি বৈশিষ্ট্য, ইসলামের

বিশ্বজনীনতা যেমন একটি বৈশিষ্ট্য, তদ্রুপ ইসলামের কলেমাও ইসলামের একটা বৈশিষ্ট্য।

ধর্মগ্রন্থ সকল ধর্মেরই আছে, কিন্তু একমাত্র ইসলাম ব্যতীত আর কোন ধর্মেরই 'কালামুল্লাহ্'বা 'আল্লাহ্র বাণী'নাই। ধর্মগ্রন্থ বলিতে ধর্মের বিবরণ বুঝায়, উহাতে থাকে কর্তব্য ও আদেশের বিবরণ। ধর্মগ্রন্থ বলিতে এ কথা বুঝায় না যে, উহার প্রত্যেকটি বাক্য ও প্রত্যেকটি শব্দ 'আল্লাহ্র' নিকট হইতে আসিয়াছে। ইসলামের পুস্তককে 'কালামুল্লাহ্'বলা হয়। কেননা উহাতে বর্ণিত বিষয়-বস্তুই শুধু আল্লাহ্র নিকট হইতে অবতীর্ণ হয় নাই-বরং উহার প্রত্যেকটি বাক্য, প্রত্যেকটি শব্দ আল্লাহ্ অবতীর্ণ করিয়াছেন। হযরত মুসা (আঃ)-এর পুস্তকের বিষয়বস্তু উহাই ছিল যাহা আল্লাহ্ জানাইয়াছিলেন ; হযরত ঈসা (আঃ) জগতের সামনে যে শিক্ষার বিষয়বস্তু তুলিয়া ধরিয়াছিলেন তাহাও আল্লাহ্ জানাইয়াছিলেন। তাঁহাদের পুস্তক আল্লাহ্র ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যের সমষ্টি নহে। একটু মনোযোগ দিলে দশ মিনিটের অধ্যয়নে যে কেহ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, তওরাত ও ইঞ্জিলের বিষয়বস্তু ঐশী হইলেও বাক্যগুলি ঐশী নহে ; অনুরূপভাবে ইহাও সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে যে, কুরআন শরীফের বিষয়বস্তু এবং বাক্য সমূহ উভয়ই ঐশী। কোরআন, তওরাত বা ইঞ্জিলের প্রতি যাহার বিশ্বাস নাই, এই তিন পুস্তক আলোচনা করিলে তিনিও বলিতে বাধ্য হইবেন যে, তওরাত ও ইঞ্জিলের রসূলদ্বয় এই দুই পুস্তককে আল্লাহ্র নিকট হইতে অবতীর্ণ বলিয়া দাবী করিয়াছেন বটে কিন্তু আল্লাহ্র রচিত বাক্য-বাণী বলিয়া দাবী করেন নাই। পক্ষান্তরে তিনি ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, কুরআনের রসূল কুরআনের বিষয়বস্তু এবং রচনা উভয়কেই আল্লাহ্র নিকট হইতে অবতীর্ণ বলিয়া দাবী করিয়াছেন। এই কারণে কুরআন করীম 'কিতাবুল্লাহ্' (আল্লাহ্র পুস্তক) এবং 'কালামুল্লাহ্' (আল্লাহ্র কথা) হইবার এই দ্বিবিধ দাবী করে ; কিন্তু তওরাত ও ইঞ্জিল নিজে 'কালামুল্লাহ্' হইবার দাবী করে নাই এবং কুরআন শরীফও উহাদিগকে 'কালামুল্লাহ্' বলে নাই। অন্যান্য ধর্ম-গ্রন্থের 'কালামুল্লাহ্' না হওয়া এবং ইসলামের ধর্ম- গ্রন্থ কুরআন- এর 'কালামুল্লাহ্' হওয়া, ইসলামের এক বৈশিষ্ট্য।

এইরূপে প্রত্যেক ধর্মের কোন না কোন নবী আছেন, কিন্তু কোন ধর্মেরই

এমন নবী নাই যিনি যুক্তি সহকারে ধর্ম সংক্রান্ত যাবতীয় সত্যের প্রচার করিয়াছেন এবং যিনি বিশ্বমানবের জন্য পূর্ণ আদর্শ বলিয়া দাবী করিয়াছেন। খৃষ্টধর্ম ইসলামের নিকটতম ধর্ম। খৃষ্টানগণ হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে। আল্লাহ্‌র পুত্র হইলে তাঁহার পক্ষে মানুষের জন্য আদর্শ হওয়া সম্ভব নহে। কারণ মানুষ খোদার মত হইতে পারে না। তওরাত হযরত মুসা (আঃ)-কে আদর্শ মানব বলিয়া দাবী করে না। হযরত মুসা বা ঈসা (আঃ) যুক্তি সহকারে ধর্ম সংক্রান্ত যাবতীয় সত্য ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়াও তওরাত কিংবা ইঞ্জিল দাবী করে নাই। কুরআন করীমে হযরত রসুল করীম (সাঃ) সম্বন্ধে এইরূপ দাবী আছে। কুরআন করীমে আঁ হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন, وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ - তিনি ধর্ম-বিধান ও ধর্ম-বিধানের যুক্তি'সমূহ শিক্ষা দেন। (সূরা বাকারা 2: 152)

ইসলামের নবী শুধু উত্তম আদর্শই স্থাপন করেন নাই বরং কুরআনের প্রত্যেক বিধানে আপন পর সকলেরই জন্য যে উপযোগিতা ও উপকারিতা রহিয়াছে তাহা যুক্তি সহকারে বুঝাইয়া দিয়াছেন। জোর করিয়া কোন বিধান মানিতে রসূল করীম (সাঃ) কাহাকেও বাধ্য করেন নাই, এইরূপে তিনি তাঁহার উম্মতের ঈমান দৃঢ় করিয়াছেন; তাহাদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্যম সৃষ্টি করিয়াছেন,নিজেকে আদর্শরূপে পেশ করিয়াছেন। এইরূপ নবী একমাত্র ইসলামেরই আছে। ইহাও ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য।

সার্বজনীনতা ইসলামের আর একটি বৈশিষ্ট্য। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, নর-নারী, প্রভু-ভৃত্য, শক্তিমান-শক্তিহীন, শাসক-শাসিত, প্রাচ্য-প্রতীচ্য, ক্রেতা-বিক্রেতা, দেশী-বিদেশী, স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, সাবালক-নাবালক সকলের জন্যই ইসলাম সুখ, শান্তি ও উন্নতির বাণী আনিয়াছে। মানব জাতির কোন অংশকেই ইসলাম বঞ্চিত করে নাই। নূতন ও পুরাতন সকল জাতিকেই ইসলাম পথ প্রদর্শন করে। 'আলিমুল গায়েব' খোদার দৃষ্টি যেমন আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র হইতে পাতালের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর উপরেও পতিত হয়, ইসলামের শিক্ষাও ঠিক তদ্রুপ ধনকুবের হইতে দীনহীন পর্যন্ত সকলেরই প্রয়োজন মিটায়।

ইসলাম অতীত ধর্ম সমূহের অনুকরণ নহে; ইহা ধর্ম ব্যবস্থার চরম পরিণতি; আধ্যাত্মিক জগতের সূর্য। ইহার প্রত্যেকটি অঙ্গ পূর্ববর্তী

ধর্মসমূহে ছিল মনে করা ভুল। নামের দিক দিয়া হীরা ও কয়লা উভয়ই কার্বন ; কিন্তু হীরা কয়লা নহে। সাধারণ পাথর ও মর্মর পাথর উভয়ই পাথর ; কিন্তু পাথর মাত্রই মর্মর পাথর নহে। তদ্রূপ যদিও সকল ধর্মই ধর্ম তথাপি ইসলাম ইসলামই ; ইসলাম এবং অন্য ধর্ম সমান নহে। ইসলামের 'কলেমা' আছে। এই কারণে সকল ধর্মেরই 'কলেমা' ছিল মনে করা ভুল।

কোরআন করীমের প্রতি মনোযোগী না হওয়ার কারণে এই ভুলের সৃষ্টি হইয়াছে। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ্; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মূসা কালীমূল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ঈসা রূহুল্লাহ্ কলেমা সৃষ্টি করা হইয়াছে। তওরাত, ইঞ্জিল বা খ্রীষ্টীয় সাহিত্যে এই সকল 'কলেমা'র নাম গন্ধও নাই। মুসলমান সমাজে বহু দুর্বলতা দেখা দিয়াছে ; কিন্তু তাই বলিয়া মুসলমান 'কলেমা' ভুলিয়া যায় নাই। অতএব, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের পক্ষে 'কলেমা' ভুলিয়া যাওয়া কিরূপে সম্ভব? আর তাহারাই যদি ভুলিয়া গিয়া থাকে এবং তাহাদের পুস্তকেও যখন নাই, তখন এই সকল কলেমার সন্ধান পাওয়া গেল কোথায়? সত্য কথা এই যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ব্যতীত আর কোন নবীরই কলেমা ছিল না। ইহা একমাত্র তাঁহারই বৈশিষ্ট্য যাহা অপর কোন নবীর ছিল না।

আঁ হযরত (সাঃ) ব্যতীত আর কোন রসূলের কলেমা না থাকার কারণ এই যে, ''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু''- আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহই উপাসনার যোগ্য নহে- একটি স্থায়ী সত্য ; ইহার সহিত স্থায়ী বৈ অস্থায়ী রসূলের নাম যুক্ত হইতে পারে না। আঁ হযরত (সাঃ)-এর পূর্ববর্তী রসূলগণের 'রেসালত' (ঐশী বার্তা) অস্থায়ী ছিল ; নির্দিষ্ট কাল পরে তাঁহাদের 'রেসালতের' পরিসমাপ্তি ঘটিবার ছিল ;আঁ হযরত (সাঃ)-এর রেসালত শেষ হইবার নহে ; কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। এই কারণে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'র সহিত 'মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' সংযুক্ত হইতে পারে ;আর কোন রসূলের নাম সংযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য কথা এই যে, ইহুদীগণ, খ্রীষ্টান এবং সাবীগণ ইহা দাবী করে না যে তাহাদের প্রতি আগত নবীগণের কোন কলেমা ছিল। অথচ মুসলমানগণ, একমাত্র যাহাদিগকে কলেমার কল্যাণে বিভূষিত করা হইয়াছে, তাহারা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য উদারতা দেখাইয়া কলেমা তৈরী করিয়া দিয়াছে। প্রত্যেক ধর্মেরই কলেমা থাকা আবশ্যক নহে। প্রত্যেক ধর্মেরই যদি

কলেমা থাকিত, তবুও আহমদীয়াতের কোনও নূতন কলেমা থাকিতে পারে না। কারণ আহমদীয়াত কোনও নূতন ধর্ম নহে ; ইহা ইসলামেরই নামান্তর মাত্র। তাই,মোহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুনিয়ার সামনে যে কলেমা পেশ করিয়াছিলেন, সেই কলেমা–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আহমদীয়াতের কলেমা। আহমদীগণ বিশ্বাস করে যে, এই বিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনি 'ওয়াহেদ ও লা-শরীক' (এক অদ্বিতীয় এবং অংশীবিহীন,) অনন্ত শক্তির অধিকারী, 'রব' (বিশ্বপালক প্রভু), রহমান (অযাচিত অসীম দাতা) রহীম, (পরম দয়াময়) মালিকে ইয়াওমেদ্দীন (বিচার দিবসের মালিক)'। কোরআন শরীফে বর্ণিত যাবতীয় গুণই তাঁহার। কোরআন শরীফে তাঁহাকে যে সকল দোষ হইতে মুক্ত বলে তৎসমুদয় হইতে তিনি মুক্ত। আহমদীগণের বিশ্বাস এই যে, মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন আব্দুল মোত্তালিব কোরায়েশী মক্কী (সাঃ) আল্লাহ্র রসূল ছিলেন, তাঁহার প্রতি শেষ শরীয়ত কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হইয়াছিল ; আরবের লোক আরবের বাহিরের লোক, সাদা-কালো প্রত্যেক জাতির জন্যই আল্লাহ্ তাঁহাকে পাঠাইয়া ছিলেন। তাঁহার নবুয়ত ততদিন পর্যন্ত চলিতে থাকিবে যতদিন ভূ-পৃষ্ঠে একটি মানুষও বাস করিতে থাকিবে। তাঁহার অনুসরণ করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। তাঁহার দাবী জ্ঞান গোচরে আসার পরেও যে ব্যক্তি তাঁহাকে অনুসরণ করিবে না, আল্লাহ্র বিচারে সে শাস্তি পাইবার উপযুক্ত। তাঁহার দাবীর প্রমাণ যে ব্যক্তির কাছে পৌঁছিয়াছে, তাঁহার অনুসরণ ব্যতীত সেই বক্তির পরিত্রাণ ও সাফল্যের জন্য আর কোন পথ নাই। তাঁহাকে অনুসরণ করাই পবিত্রতা অর্জনের একমাত্র পথ।

আহমদীদের সম্বন্ধে কতকগুলি সন্দেহের নিরসন

খতমে নবুয়ত

অনেকে মনে করে যে, আহমদীগণ 'খতমে নবুয়ত' স্বীকার করে না এবং আঁ হযরত (সাঃ) কে 'খাতামান্নাবীঈন' বলিয়া বিশ্বাস করে না। ইহা একটি ধোকা বৈ আর কিছুই নহে এবং ইহা অজ্ঞতার পরিচায়ক। আহমদীগণ নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দেয় এবং কলেমা শাহাদাত পড়ে। তাহাদের পক্ষে 'খতমে নবুয়ত' অস্বীকার করা কিরূপে সম্ভব? আঁ হযরত (সাঃ) কে 'খাতামান্নাবীঈন' না বলাই বা কিরূপে সম্ভব? আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

(সূরা আহযাব 33: 41)

'মোহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহেন, কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসূল ও খাতামাননবীঈন।' কোরআন শরীফের প্রতি ঈমান রাখিয়া তাহারা কিরূপে আল্লাহ্‌র এই স্পষ্ট উক্তি অগ্রাহ্য করিতে পারে?

আহমদীগণ নিশ্চয়ই এ কথা বলে না যে, আঁ হযরত (সাঃ) 'খাতামান নবীঈন' নহেন। তাহারা কেবল এই কথা বলে যে, 'খাতামান নবীঈন' শব্দ-যুগলের যে অর্থ মুসলমানদিগের মধ্যে বর্তমানে প্রচলিত আছে, উল্লেখিত আয়াত তাহা সমর্থন করে না ; আঁ হযরত (সাঃ) এর যে উচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে, ঐ প্রচলিত অর্থ হইতে তাহা প্রকাশ পায় না।

আহমদীয়া জামাত 'খাতামান নবীঈন' শব্দ-যুগলের যে অর্থ করে, তাহা আরবী ভাষা ও অভিধান সম্মত। আহমদীদের কৃত অর্থ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) প্রভৃতি সাহাবাগণের দ্বারা সমর্থিত এবং সেই অর্থ সকল মানুষের উপরে আঁ হযরত (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে। আহমদীগণ 'খতমে নবুয়ত' অস্বীকার করে না ;খতমে নবুয়তের প্রচলিত ভ্রান্ত অর্থ অস্বীকার করে । 'খতমে নবুয়ত' অস্বীকার করা কুফরী

কাজ। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আহমদীগণ মুসলমান এবং ইসলামের অনুসরণকেই তাহারা মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া জ্ঞান করে।

সমগ্র কুরআনে ঈমান

অনেকে মনে করে আহমদীগণ সমগ্র কোরআন শরীফ মানে না আংশিকভাবে মানে। সম্প্রতি কোয়েটায় অনেকেই আমাকে বলিয়াছে যে আলেমগণ তাহাদিগকে এই কথা বলিয়াছেন। ইহা আহমদীয়াতের শত্রুগণের রচিত একটি মিথ্যা অপবাদ বৈ আর কিছুই নহে। আহমদীগণ কোরআন শরীফকে অপরিবর্তনীয় বলিয়া বিশ্বাস করে, কোরআন শরীফের 'বিসমিল্লাহ্'র বে হইতে 'আন্নাস' এর সিন পর্যন্ত প্রত্যেকটি অক্ষরকে আল্লাহ্ হইতে অবতীর্ণ এবং পালনযোগ্য বলিয়া মনে করে।

ফেরেস্তাদের প্রতি ঈমান

কেহ কেহ বলে আহমদীগণ ফেরেস্তা ও শয়তানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ইহাও একটি মিথ্যা অপবাদ। কোরআন শরীফে ফেরেস্তা ও শয়তানের উল্লেখ আছে। আহমদীগণ কোরআন শরীফের উপর বিশ্বাস রাখিয়া কিরূপে তাহা অস্বীকার করিতে পারে? খোদার ফজলে ফেরেস্তার প্রতি আমাদের বিশ্বাস তো আছেই, অধিকন্তু আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, কোরআন শরীফ অনুসারে চলিয়া ফেরেস্তার সংসর্গ লাভ করা যায়, ফেরেস্তার নিকট হইতে জ্ঞান সঞ্চয় করা যায়। এই প্রবন্ধের লেখক স্বয়ং ফেরেস্তার নিকট হইতে অনেক কিছু শিখিয়াছে। একদা এক ফেরেস্তা আমাকে সূরা ফাতেহার তফসীর শিখাইয়াছিল। সেই অবধি সূরা ফাতেহার অর্থ ও তত্ত্ব অফুরন্ত ভাবে আমার নিকট খুলিয়া গিয়াছে। আমি দাবী করিয়া বলিতেছি যে, অন্য যে কোন ধর্মের লোক তাহার সমগ্র ধর্ম গ্রন্থ হইতে যে পরিমাণ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বর্ণনা করিতে পারিবে, খোদার ফজলে তাহা হইতে অনেক বেশী জ্ঞান আমি শুধু সূরা ফাতেহা হইতে বর্ণনা করিতে পারি। বহুদিন হইতে আমি এই দাবী করিতেছি। কিন্তু কেহ আমাকে পরীক্ষা করিতে আসে নাই। আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্বের

প্রমাণ, রসূলের আবশ্যকতা, পূর্ণ শরীয়তের লক্ষণাবলী, মানব মন্ডলীর জন্য উহার প্রয়োজনীয়তা, দোয়া, তকদীর, হাশর- নশর (মৃত্যুর পর পুনরুত্থান), বেহেশ্‌ত দোযখ ও উহার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্বন্ধে সূরা ফাতেহা হইতে যে আলোক পাওয়া যায়, অন্য ধর্মগ্রন্থের শত শত পৃষ্ঠা পাঠ করিয়াও তাহা পাওয়া যায় না। ফল স্বরূপ ফেরেস্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা তো দূরের কথা, বরং ফেরেস্তা হইতে আহমদীরা উপকৃত হইতেছে বলিয়া তাহাদের দাবী।

শয়তানের কথা

শয়তান তো একটা ঘৃণিত সত্ত্বা। তাহার উপর ঈমানের প্রশ্নই উঠিতে পারে না! হাঁ, কোরআন শরীফ হইতে শয়তানের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহার অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি। তাহার রাজত্বের অবসান করিবার দায়িত্ব আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের প্রতি ন্যাস্ত করিয়াছেন। স্বপ্নে আমি শয়তানকে দেখিয়াছি, তাহার সহিত আমার কুস্তিও হইয়াছে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ও 'তাউয' এর (আউযুবিল্লাহ্‌ পাঠের) পূর্ণ প্রভাবে তাহাকে পরাভূত করিয়াছি। আমাকে আল্লাহ্‌তা'লা একদা স্বপ্নে বলিয়াছিলেন যে, ''তোমাকে যে কার্যভার দেয়া হইবে উহার পথে শয়তান ও তাহার বংশধরগণ অন্তরায় সৃষ্টি করিবে। এই সমস্ত অন্তরায় গ্রাহ্য করিও না; 'খোদাকে ফজল অওর রহমকে সাথ' (আল্লাহ্‌র কৃপায় ও কল্যাণে) বলিতে বলিতে অগ্রসর হইতে থাকিও। তারপর আমি সেই দিকে চলিলাম যেদিকে যাইবার জন্য এই স্বপ্নে আল্লাহ্‌ আমাকে আদেশ দিয়াছিলেন। তারপর দেখিলাম শয়তান ও তার বংশধরগণ আমাকে শাসাইতেছে এবং নানাভাবে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করিতেছে। কোথাও দেখি শুধুই মাথা, কোথাও দেখি শুধু মস্তকহীন দেহ আমার দিকে আসিতেছে, কোথাও দেখি শয়তান বাঘ, চিতা ও হাতির আকার ধারণ করিয়া আসিতেছে। 'খোদাকে ফজল অওর রহমকে সাথ' বলিতে বলিতে আমি অগ্রসর হইতে থাকিলাম। এই বাক্য উচ্চারণ করা মাত্র শয়তান পলায়ন করিতেছিল এবং পরক্ষণে অন্য আকার ধারণ করিয়া আবার আসিতেছিল। আবার এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া উহাকে বিনাশ করিতেছিলাম। অবশেষে আমি গন্তব্য স্থানে

পৌঁছিলাম, শয়তান ময়দান ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। সেই অবধি আমি আমার যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ লেখার শিরোনামে এই বাক্য লিখিয়া আসিতেছি। ফলকথা আমরা ফেরেস্তার প্রতি ঈমান রাখি এবং শয়তানের অস্তিত্ব স্বীকার করি।

মোজেযা

কেহ কেহ বলে আহমদীগণ 'মোজেযা' (ঐশী নিদর্শন) বিশ্বাস করে না। বাস্তব সত্য ইহার বিপরীত। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের -এর মোজেযা তো আছেই, তাঁহার সত্যিকার অনুসারীকেও আল্লাহ্ মোজেযা দেন। কুরআন শরীফ আঁ হযরত (সাঃ)-এর মোজেযায় পরিপূর্ণ। একমাত্র চির-অন্ধ ব্যক্তিই ইহা অস্বীকার করিতে পারে।

নাজাত (মুক্তি)

কেহ কেহ এই ভুল ধারণা পোষণ করে যে, আহমদীগণের মতে আহমদী ব্যতীত আর সমস্ত লোকই জাহান্নামে যাইবে। এই অপবাদ একমাত্র অজ্ঞতা বা শত্রুতা প্রসূত। আমরা নিশ্চয় এরূপ মনে করি না। আমাদের মতে আহমদীর পক্ষেও জাহান্নামে যাওয়া সম্ভব এবং যাহারা আহমদী নহে তাহাদের পক্ষেও জান্নাতে যাওয়া সম্ভব। ধর্মে মৌখিক স্বীকারোক্তি কাহাকেও জান্নাতের অধিকারী করে না ; ধর্মে আরোপিত দায়িত্ব পালনের পরই জান্নাতের অধিকারী হওয়া যায়। তদ্রূপ মৌখিক অস্বীকারের ফলেও জাহান্নামী হয় না ; জাহান্নামী হওয়া বহু শর্ত সাপেক্ষ। যত বড় সত্যই হউক না কেন, পূর্ণভাবে জানিয়া বুঝিয়া সজ্ঞানে অগ্রাহ্য না করিলে কেহই জাহান্নামী হয় না। স্বয়ং হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, শৈশবে যাহাদের মৃত্যু হয়, অতি বৃদ্ধ হইয়া যাহাদের বুদ্ধি বিপর্যয় ঘটিয়াছে, যাহারা বনে-জঙ্গলে ও পর্বতে থাকে, যাহাদের বুদ্ধি নাই অথবা যাহারা পাগল, তাহাদিগকে কোন হিসাব দিতে হইবে না। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদের

নিকট নবী পাঠাইবেন এবং তাহাদিগকে সত্য-মিথ্যা বিচার করিয়া দেখিবার সুযোগ দিবেন। তখন যাহারা সত্য গ্রহণ করিবে, তাহারা জান্নাতে যাইবে এবং যাহারা অগ্রাহ্য করিবে, তাহারা জাহান্নামে যাইবে। নাজাত (মুক্তি) সম্বন্ধে আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস এই যে, যাহারা সত্য বুঝিতে চেষ্টা করে না, সত্য মানিতে হইবে ভয়ে যাহারা উহাতে কান দেয় না, সত্যকে সত্য বলিয়া বুঝিতে পারা সত্ত্বেও গ্রহণ করে না, শুধু তাহারাই শাস্তির পাত্র। কিন্তু আল্লাহ্‌র দয়া অসীম। এইরূপ ব্যক্তিদিগকে ক্ষমা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব। আল্লাহ্‌র কৃপা বিতরণের ভার আমাদের হাতে নাই। দাস তাঁহার প্রভুকে দান করা হইতে বিরত রাখিতে পারে না। তিনি সৃষ্টিকর্তা, প্রভু এবং অধিপতি। আমরা তাঁহার দাস। আমাদের দৃষ্টিতে যাহার নাজাত অসম্ভব, তাঁহার অসীম-জ্ঞান ও কৃপায় এরূপ ব্যক্তিও যদি ক্ষমা লাভ করে, তাহাতে আমরা আপত্তি করিবার কে এবং তাঁহার দানের হাতকে রোধ করিবার আমরা কে?

নাজাত সম্বন্ধে আহমদীদিগের ধারণা এত উদার যে, এই কারণে কোন মৌলবী তাহাদিগকে কাফের সাব্যস্ত করিয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি, কেহই চিরকাল দোযখে থাকিবে না- মুমেনও না কাফেরও না। কুরআন করীমে আল্লাহ্ বলিয়াছেন,

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (সূরা আরাফ 7: 157)

"আমার অনুগ্রহ সকল পদার্থকে ঘিরিয়া রহিয়াছে।"

فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (সূরা আল্‌কারিয়াহ 101:10)

"দোযখ কাফেরদের মা।" অর্থাৎ- দোযখের সহিত কাফেরদের সম্বন্ধ মায়ের সহিত সন্তানের সম্বন্ধের অনুরূপ হইবে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

(সূরা আল যারিয়াত 51: 57)

"আমার উপাসনা করিবার জন্যই জিন ও ইনসানের সৃষ্টি করিয়াছি।" এইরূপ আরো বহু আয়াত আছে। অতএব আল্লাহ্‌র এই সকল উক্তির বিরুদ্ধে আমরা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি যে, দোযখীদিগের প্রতিও

এক সময় তাঁহার অনুগ্রহ বর্ষিত হইবে না? সন্তান চিরকাল মাতৃ গর্ভে থাকে না। আমরা কিরূপে বিশ্বাস করিব যে, নরকবাসী কখনও নরকের গর্ভ হইতে বাহিরে আসিবে না? আর কিরূপে বিশ্বাস করিব যে, চিরকালই কতক লোক শয়তানের দাস থাকিয়া যাইবে এবং কখনও তাহারা আল্লাহ্‌র দাস হইবে না, যে জন্য তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছিল? আর কিরূপেই বা একথা বিশ্বাস করিতে পারি যে, আল্লাহ্‌র প্রেম কখনও ইহাদিগকে বলিবে না যে,

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي (সূরা আল ফজর 89 ঃ 30-31)

আমার দাস হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর!

হাদিস ও ফেকাহ্

অনেকের এই ভুল ধারণা আছে যে, আহমদীগণ হাদীস ও ফেকাহ্ মানে না। এই দুইটি ধারণাই ভ্রান্ত। আহমদীগণ ফেকাহ-বিদ ইমামগণকে অবশ্যই মানে, তবে আঁ হযরত(সাঃ) যে কথা বলিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথাই আহমদীরা মানে না। তাঁহার উক্তির বিরুদ্ধে কথা মানিলে তাঁহাকে অবমাননা করা হয়। প্রভুর কথা না মানিয়া ভৃত্যের কথা মানা যায় না। গুরুর শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া শিষ্যের শিক্ষা গ্রহণ করা যায় না। ইমামগণ যত বড়ই হউন না কেন, আঁ হযরত (সাঃ) র শিষ্য সেবক বৈ আর কিছুই ছিলেন না। এই শিষ্যত্ব ও সেবকত্বের কারণেই তাঁহাদের যাবতীয় মর্যাদা ও সম্মান। আঁ হযরত (সাঃ) র কথাই শেষ কথা ; তাঁহার কথার উপরে আর কেহ কিছু বলিতে পারে না।

আঁ হযরত (সাঃ) এর প্রতি যে সকল কথা আরোপ করা হয়, তাহা সত্যই তিনি বলিয়াছেন কিনা তাহা বুঝিবার উপায় এই যে, কুরআনের উক্তি বিরুদ্ধ কোন কথাই আঁ হযরতের উক্তি নহে। এইরূপ উক্তিকে কাহারও রদ করিবার বা ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার কাহারও অধিকার নাই। হাদীসের বর্ণনাকারীগণ মানুষই ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যেও ভাল-মন্দ লোক ছিল ; স্মরণশক্তি কাহারও ভাল ছিল, কাহারও মন্দ ছিল ; বুঝিবার ক্ষমতাও বেশি-কম ছিল। 'মোহাদ্দেসীন' বা হাদীসবিদ আলেমগণও স্বীকার

করেন যে, হাদীস গ্রন্থ সমূহে যে সকল কথা দেখা যায় তাহার কতক আঁ হযরত (সাঃ)-এর নিশ্চয় উক্তি ('কাতাঈ') কতক গ্রহণযোগ্য ('আম'), কতক সন্দেহযুক্ত ('মশকুক') কতক সম্ভাবিত ('জন্নি'), কতক জাল বা কৃত্রিম ('অজঈ')। পক্ষান্তরে কোরআন শরীফ সন্দেহের অতীত। এ কারণে কোরআনের বিরোধী কোন কথাকে হাদীস বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আর যে সকল হাদীস কোরআন বিরোধী না হইলেও সত্য সত্যই আঁ হযরত (সাঃ)- এর উক্তি কিনা তাহা নির্ণয় করা কঠিন এবং যাহার একাধিক অর্থ হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে ইমামগণ মত দিবার অধিকারী। কোরআন ও হাদীসের অনুশীলনে তাঁহারা সারা জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যে সকল মুসলমান এইভাবে কোরআন ও হাদীস চর্চা করে নাই এবং যাহাদের এরূপ যোগ্যতাও নাই, তাহাদের একথা বলিবার অধিকার নাই যে, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহ্মদ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক প্রভৃতি ইমামগণ আমাদের মতই একজন মুসলমান ছিলেন ; আমরা তাহাদের অভিমত গ্রহণ করিব কেন? চিকিৎসার ব্যাপারে ডাক্তারের কথাই গ্রহণযোগ্য ; আইনঘটিত ব্যাপারে আইনজীবির কথাই গ্রহণযোগ্য ; ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারেও ইমামগণের কথাই গ্রহণযোগ্য। ধর্মের অনুশীলনই ছিল তাঁহাদের সারা জীবনের সাধনা। তাঁহাদের বিচার শক্তিও ছিল অসাধারণ। তাঁহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র ব্যবহার হইতেও তাঁহাদের ধর্ম-পরায়ণতা এবং পবিত্রতার যথেষ্ট প্রমান পাওয়া যায়।

ফল কথা, আহ্মদীগণ 'মুকাল্লিদ' (ফিকাহবিদ ইমামগণের অনুসারী) বা 'গায়ের মুকাল্লিদ' (আহলে হাদীস) কাহারও কথা ষোল আনা মানে না। হযরত ইমাম আবূ হানিফার (রাঃ) ন্যায় আহমদীগণও বলে যে, কোরআন সকলের উপরে, তারপর হাদীস এবং হাদীসের নিম্নে ইমামগণের অভিমত। আহ্মদীগণ কোন কোন বিষয়ে হানাফী এবং কোন কোন বিষয়ে আহ্‌লে হাদীস। অন্য কথায়, আহমদীগণ ইমাম আবূ হানিফার নীতি স্বীকার করে, কিন্তু প্রামাণিক হাদীসের বিরুদ্ধে সমস্ত ইমামের কোন অভিমত থাকিলে তাহা মানে না।

তকদীর

অজ্ঞ লোকদিগের আর একটা ভুল ধারণা এই যে, আহ্‌মদীগণ 'তকদীর' মানে না। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ্‌তা'লার নির্দিষ্ট তকদীর আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকিবে, কেহই উহার পরিবর্তন করিতে পারে না। তবে আমরা চোরের চুরি করা, বে-নামাজীর নামাজ না পড়া, মিথ্যাবাদীর মিথ্যা বলা, প্রতারকের প্রতারণা, খুনীর খুন করা, ব্যভিচারীর ব্যভিচার প্রভৃতি কুকাজ ও অপরাধকে আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট তকদীর বলিয়া মানি না। ইহা তো নিজের মুখের কালিমা খোদার মুখে লেপন করার চেষ্টা। তকদীর ও তদবীর চির প্রবহমান দুইটি সমান্তরাল স্রোতস্বিনী। ইহাদের একটি অন্যটির গতি পথে বাধা সৃষ্টি করে না ; আল্লাহ্ বলিয়াছেন,

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ (আর রহমান 55: 21)

এতদুভয়ের মধ্যে একটা ব্যবধানকারী বিদ্যমান আছে ; ইহারা তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। (আর-রহমান : আয়াত ২১) তদবীর তদবীরের ক্ষেত্রে কাজ করিতেছে, তকদীর তকদীরের ক্ষেত্রে কাজ করিতেছে। যেখানে তকদীর অবশ্যম্ভাবী, তদবীরে সেখানে কোন ফল হয় না। আর যেখানে তদবীরের পথ আছে সেখানে তকদীরের ভরসায় বসিয়া থাকার অর্থ নিজের হাতেই নিজের ভবিষ্যত নষ্ট করা। তকদীরের আবরণে অনেকে তাহাদের দুস্কৃতি ঢাকিতে চেষ্টা করে ; আলস্য ও কর্ম বিমুখতার প্রশ্রয় দেয়। তদবীরের ক্ষেত্রে তকদীরের উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকার ফল সর্বদাই অশুভ এবং সর্বনাশের হেতু। তকদীরের উপর ভরসা করিয়া মুসলমান তদবীরের ক্ষেত্রেও তদবীর করে নাই। ফলে তাহাদের ধর্ম গিয়াছে ; পার্থিব সম্পদও গিয়াছে। তদবীরের ক্ষেত্রে তকদীরের ভরসায় বসিয়া না থাকিলে তাহাদের অবস্থা এতদুর শোচনীয় হইত না।

জেহাদ

আহ্‌মদীয়া জামা'ত সম্বন্ধে আর একটা ভুল ধারণা এই যে, তাহারা

জেহাদে অবিশ্বাসী। এই ধারণা ঠিক নহে। আহ্‌মদীগণ জেহাদের আবশ্যকতা স্বীকার করে। তাহাদের মতে যুদ্ধ দুই প্রকারের, পার্থিব যুদ্ধ এবং ধর্ম-যুদ্ধ বা জেহাদ। শত্রু যখন বাহুবলে ধর্ম নষ্ট করিতে চেষ্টা করে, তরবারীর ভয় দেখাইয়া ঈমান নষ্ট করিতে উদ্যত হয়, ধর্ম রক্ষার জন্য তখন যে যুদ্ধ করা হয়, তাহাই জেহাদ বা ধর্ম যুদ্ধ। এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে জেহাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। তবে জেহাদের একটি অপরিহার্য শর্ত আছে। জেহাদ করিতে হইলে প্রথমেই ইমাম বা নেতা আবশ্যক, এবং নেতার পক্ষ হইতে জেহাদ ঘোষণা হওয়া আবশ্যক। নেতা যাহাকে প্রথমে যুদ্ধে আসিতে আহ্বান করিবেন, প্রথমে তাহারই আসা আবশ্যক এবং অবশিষ্ট মুসলমানের আসিবার জন্য প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। ইমাম যাহাদিগকে জেহাদের জন্য আহ্বান করেন, না আসিলে শুধু তাহারাই আল্লাহ্‌র হুজুরে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে ; অবশিষ্ট মুসলমান অপরাধী হইবে না। ইমাম না থাকিলে জেহাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের ব্যক্তিগত ফরজ হইয়া দাঁড়ায় এবং জেহাদ না করিলে প্রত্যেক মুসলমানই আল্লাহ্‌র হুজুরে অপরাধী।

আহ্‌মদীগণের ধারণা এই যে, ইংরেজ অস্ত্রবলে ধর্ম নষ্ট করিতে চেষ্টা করে নাই। এই কারণে তাহারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ সমর্থন করে নাই। আহ্‌মদীদের এই ধারণাকে যে সকল আলেম ভুল মনে করেন, তাহারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন কি? ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা ফরজ হইয়া থাকিলে আহ্‌মদীগণ তো আল্লাহ্‌র হুজুরে এই জবাব দিবে যে, আমরা বুঝিতে ভুল করিয়াছিলাম ; জেহাদ আবশ্যক মনে করি নাই বলিয়া আমরা জেহাদ করি নাই। কিন্তু যে সকল আলেম ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা ফরজ মনে করেন অথচ জেহাদ করেন নাই, আল্লাহ্‌র হুজুরে তাঁহারা কি জবাব দিবেন? তাঁহারা কি এই কথা বলিবেন যে, হে আল্লাহ্‌, জেহাদের সময় তো আসিয়াছিল ; জেহাদ করাকে ফরজও মনে করিয়াছিলাম ; কিন্তু জেহাদ করিবার মত সাহস আমাদের ছিল না, যাহাদের সাহস ছিল তাহাদিগকেও জেহাদ করিতে বলিতে সাহস পাই নাই ; আমাদের ভয় হইত যে, জেহাদের কথা বলিলে ইংরেজ

আমাদিগকে জেলে দিবে। এই দুই উত্তরের মধ্যে কোন উত্তর আল্লাহ্‌র হুজুরে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে?

এতক্ষন পর্যন্ত যাহা বলিলাম সেসব মূলত ঐ সমস্ত লোকদের সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে যাহারা আহ্‌মদীয়াত সম্পর্কে সম্যক ধারনা রাখে না কিংবা শত্রুদের নিকট হতে আহ্‌মদীয়াত সম্পর্কে শুনে থাকে অথবা মনে মনে আহ্‌মদীয়াত সম্পর্কে মনগড়া ধারনা পোষন করিয়া থাকে। এখন যাঁহারা আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান রাখেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলিব। তাঁহারা জানেন যে, আহ্‌মদীগণ তওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসী, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতিও বিশ্বাসী, তাহারা কুরআন, হাদীস মানিয়া চলে, নামায পড়ে, রোযা রাখে, যাকাত দেয়, হাশর নশর (পুনরুত্থান) বিশ্বাস করে, জাযা-সাজা (পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি) হইবে বলিয়া বিশ্বাস করে। তাঁহাদের আপত্তি এই যে, আহ্‌মদীগণ একটা নতুন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া অনর্থক মুসলমানদিগের মধ্যে বিভেদ আনিয়াছে। তাহাদের নিকট আহ্‌মদীগণের ধর্ম বিশ্বাস এবং তাহাদের আমল কোন আপত্তিজনক বিষয় নয় কিন্তু নূতন একটি জামা'ত সৃষ্টি তাহাদের নিকট আপত্তি জনক মনে হইয়াছে। তাহারা মনে করে যখন কোন পার্থক্যই নেই তবে এত বিভেদ কেন, আর যখন কোন বিরোধ নেই সেক্ষেত্রে নূতন মসজিদ তৈরী করিবার কি কারণ থাকিতে পারে?

স্বতন্ত্র জামাত কেন

স্বতন্ত্র জামাত কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দুই ভাবে দেওয়া যাইতে পারে। যুক্তির সাহায্যে এবং আধ্যাত্মিক ভাবে। যুক্তির দিক হইতে বক্তব্য এই যে, জামা'ত বলিতে লোক সংখ্যাকে বুঝায় না; হাজার, লক্ষ বা কোটি লোককে বুঝায় না; যাহাদের সমবেত সিদ্ধান্ত ও সাধারণ কার্যতালিকা আছে, তাহাদিগকে বুঝায়। পাঁচ সাত জন লোকেরও একটি জামা'ত হইতে পারে, যদি তাহাদের সমবেত সিদ্ধান্ত ও সাধারণ কার্যতালিকা থাকে। নবুওয়াতের প্রথম দিন মাত্র চারি ব্যক্তি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিলেন, তখনও মুসলমানদিগের একটি জামা'ত ছিল। তিনি ছিলেন এই জামা'তের নেতা এবং পঞ্চম ব্যক্তি। পক্ষান্তরে সংখ্যায় আট দশ হাজার হইলেও মক্কার পৌত্তলিকগণের কোন জামা'ত

ছিল না; সমগ্র আরববাসীরও কোন জামা'ত ছিল না। কারণ তাহাদের সমবেত সিদ্ধান্ত এবং সাধারণ কার্যতালিকা ছিল না।

আহ্‌মদীগণ স্বতন্ত্র জামা'ত সৃষ্টি করিয়াছে বলিবার পূর্বে দেখা আবশ্যক যে, মুসলমানের কোন সমবেত সিদ্ধান্ত ও সাধারণ কার্যতালিকা আছে কিনা। ভিতরকার বিবাদ-নিষ্পত্তি করিতে সক্ষম তাহাদের কোন প্রতিষ্ঠান আছে কিনা। আপোষে বিবাদ বিসম্বাদ হওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। আনসার ও মুহাজিরদিগের মধ্যেও বিবাদ বাধিত। বিভিন্ন গোষ্ঠির মুসলমানদের মধ্যেও বিবাদ দেখা দিত। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর হস্তক্ষেপেই এই সকল বিবাদ দূরীভূত হইত। তাঁহার তিরোধানের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের হস্তক্ষেপে এই বিবাদ দূরীভূত হইত। খোলাফায়ে রাশেদীনের পরেও প্রায় সত্তর বৎসর সমগ্র মুসলমান জাতি একই রাষ্ট্রের অধীনে সংহত ছিল। এই রাষ্ট্রকে ভাল-মন্দ যাহাই বলা হউক না কেন, ইহা সমগ্র মুসলিম দুনিয়াকে একই ব্যবস্থার অধীনে সংহত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই রাষ্ট্রের অবসানে মুসলিম দুনিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। একাংশ ছিল স্পেনীয় খলীফাদিগের অধীনে। আর অপরাংশ ছিল বাগদাদের খলীফাদিগের অধীনে। এই সময়েও মুসলমানদিগের সংহতি বা জামা'তের ততটা ক্ষতি হয় নাই। তখনও দুনিয়ার অধিকাংশ মুসলমান একই ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে সংহত ছিল।

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর তিন শত বৎসর পরে মুসলিম সংহতি বা জামা'ত ভাঙ্গিয়া পড়ে। তিনি বলিয়াছিলেন,

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ يَفْشُوا الْكَذِبُ

مسلم كتاب الفضائل فى فضل الصحابة ثمّ الّذين يلونهم

"আমার শতাব্দী সর্বোৎকৃষ্ট, তারপর উহার সন্নিহিতগণ, তারপর উহার সন্নিহিতগণ,অতঃপর,মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হইবে।"

(মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল)

বস্তুতঃ এইরূপেই ঘটিয়াছে। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর তিন শত বৎসর পরে বিশ্ব-মুসলিম সমাজ ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। গত তিন শত বৎসরের মধ্যে তাহাদের পতন চরমে পৌঁছিয়াছে।

মুসলিম জগতের এহেন অবস্থায় সমবেত সিদ্ধান্ত ও সাধারণ কার্যতালিকাসহ

কোন ইসলামী জামা'তের উদ্ভব হইলে, এ কথা বলা যায় না যে, স্বতন্ত্র জামা'ত গঠন করা হইয়াছে। বরং এই কথাই বলা যাইতে পারে যে, জামা'ত ছিল না, জামা'ত গঠন করা হইয়াছে।

এমন সময়ও ছিল, যখন এক একজন মুসলমান বাদশাহের ভয়ে সমগ্র ইউরোপ কাঁপিত। আর এখন সমগ্র মুসলিম জগৎ ইউরোপ আমেরিকার এক একটি শক্তির ভয়ে কাঁপে। মিশর, ইরাক, সৌদী আরব, সিরিয়া, লেবানন ও প্যালেষ্টাইনের মিলিত মুসলিম শক্তি ক্ষুদ্র ইসরাঈল রাষ্ট্রের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। আমেরিকা ও ইংরেজ ইসরাঈলের সাহায্য করিতেছে সত্য কিন্তু এই কথাও তো সত্য যে, সমগ্র আরবের সম্মিলিত শক্তি আমেরিকা ও ইংরেজের পরোক্ষ সাহায্যপুষ্ট ইসরাঈলের সহিত পারিতেছে না।

বহু মুসলিম রাষ্ট্র আছে, কিন্তু জামা'ত বা সংহতি বলিতে যাহা বুঝায়, মুসলমানদিগের তাহা নাই। খোদার ফযলে শ্রেষ্ঠতম মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের উদ্ভব হইয়াছে। তবে ইসলাম বা মুসলমান বলিতে পাকিস্তান বুঝায় না; আফগানিস্তান, ইরাক, আরব, মিশর বা অন্য কোন মুসলিম রাষ্ট্রকেও বুঝায় না। ইসলাম বলিতে সারা দুনিয়ার মুসলমানের একতা ও সংহতির বন্ধনকে বুঝায়। মুসলমানদিগের মধ্যে তাহা নাই। পাকিস্তান আফগানিস্তানকে ভালবাসে; আফগানিস্তানও পাকিস্তানকে ভালবাসে; কিন্তু তাহারা পরস্পর পরস্পরের সকল কথা মানিতে প্রস্তুত নহে। উভয়ের রাষ্ট্রনীতি পৃথক এবং প্রত্যেকে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীন। ব্যক্তিগত অবস্থাও এইরূপ; প্রত্যেক ইরাকী, ইরানী,মিশরী স্বতন্ত্র। দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে একসূত্রে গাঁথিয়া একই সাধারণ পথে পরিচালিত করিবার মত কোন প্রতিষ্ঠান নাই। ফল কথা, বহু মুসলমান আছে, বহু মুসলমান রাষ্ট্র আছে; উহাদের মধ্যে খোদার ফযলে অনেক রাষ্ট্র শক্তিশালীও হইতেছে। কিন্তু মুসলিম সংহতি বা জামা'ত নাই।

মনে করুন, পাকিস্তানের নৌবহর ভারত মহাসাগরে পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। পাকিস্তানের সামরিক শক্তির ভয়ে ভারত ইউনিয়ন কাঁপিতেছে; পৃথিবীর সমস্ত অর্থ-কেন্দ্র পাকিস্তানের করতলগত হইয়াছে; পাকিস্তানের প্রভাব আমেরিকা হইতেও বেশী হইয়াছে; এতদ্‌সত্ত্বেও ইরান, সিরিয়া,

ফিলিস্তিন এবং মিশর প্রভৃতি মুসলিম রাষ্ট্রগুলি পাকিস্তানের সহিত একত্রীভূত হইতে প্রস্তুত হইবে কি? নিশ্চয় না। তাহারা পাকিস্তানের উচ্চ মর্যাদা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবে; উহার সহিত সহানুভূতি দেখাইতে প্রস্তুত হইবে, কিন্তু উহার মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব বিলীন করিতে প্রস্তুত হইবে না।

খোদার ফযলে মুসলিম রাষ্ট্রগুলি উন্নতি করিতেছে। নূতন নূতন মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্ভবও হইতেছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দুনিয়ার সকল মুসলমানকে লইয়া এক ইসলামী জামা'ত নাই। প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্বতন্ত্র রাজনীতির অনুসরণ করিতেছে এবং তাহারা পৃথক পৃথক রাজ্যে বিভক্ত। তাহাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য কোন শক্তি নাই।

আরবের মুসলমানদের নাম ইসলাম নয়। সিরিয়ার মুসলমানদের নাম ইসলাম নয়। ইরানের মুসলমানদের নাম ইসলাম নয়। আফগানিস্তানের মুসলমানদের নাম ইসলাম নয়। যখন দুনিয়ার সকল দেশের মুসলমান কোন প্রতিষ্ঠানের অধীনে ইসলামের নামে একত্রিত হয়, তখন উহাকেই ইসলামী জামা'ত বলা যাইতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে এইরূপ জামা'ত কায়েম না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের রাজ্য বা রাষ্ট্র থাকিলেও, আমরা ইহা বলিতে বাধ্য যে, মুসলমানদের কোন জামা'ত নাই।

মুসলমানদিগের রাষ্ট্রীয় সংহতি নাই, একথা যেমন সত্য, দুনিয়ার সকল মুসলমানকে একতাবদ্ধ করিবার জন্য তাহাদের কোন সর্বজনগৃহীত কর্মসূচী নাই একথাও তেমনি সত্য। ব্যক্তিগত ভাবে কোথাও মুসলমানদের পক্ষে ইসলামের কোন এক শত্রুর মুকাবিলা করা এক কথা; আর এক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাধীনে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের পক্ষে সমবেতভাবে ইসলামের সমুদয় শত্রুর প্রতিরোধ করা অন্য কথা। সুতরাং কর্মসূচীর দিক হইতে বিচার করিলেও দেখা যায় যে, মুসলমানদের কোন জামা'ত নাই।

এইরূপ অবস্থায় যদি কোন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উল্লিখিত দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া যদি তাহারা দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলে এরূপ আপত্তি করা যাইবে না যে, একটি নূতন জামা'ত গঠন করা হইয়াছে। বরং

বলিতে হইবে যে, কোন জামা'ত ছিল না। এখন এক জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যাহারা সন্দেহ করেন যে, এক নামায, এক কেবলা, এক কুরআন এবং এক রসূল হওয়া সত্ত্বেও আহ্‌মদীগণ পৃথক জামা'ত কিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিল? তাহাদিগকে আমি গভীরভাবে চিন্তা করিতে বলি যে, ইসলামের এখন এক জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় আসিয়া গিয়াছে। এ কাজের জন্য আর কতদিন অপেক্ষা করা যাইবে? মিশর নিজের জায়গায় কাজ করিয়া যাইতেছে, ইরান নিজের জায়গায় কাজ করিয়া যাইতেছে, আফগানিস্তান নিজের জায়গায় কাজ করিয়া যাইতেছে। অপরাপর মুসলিম রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ জায়গায় নিজ নিজ কাজ করিয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহাদের উপস্থিতি সত্ত্বেও একটি বিরাট ফাঁক ও অভাব রহিয়া যাইতেছে। এই ফাঁক ও অভাব পূরণ করিবার জন্য আহ্‌মদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যখন তুর্কিগণ তুরস্কের খেলাফতের অবসান করিয়া দিল, তখন মিশরের আলেম সমাজের এক দল মিশরের বাদশাহ্‌কে খলীফা করিবার জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন (কোন গোপন সূত্রে প্রকাশিত হয় যে, এই আন্দোলন মিশরের বাদশাহ্‌র ইঙ্গিতেই হইয়াছিল)। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মিশরের বাদশাহ্‌কে খলীফাতুল মুসলেমীন পদে প্রতিষ্ঠিত করা। এতদ্দ্বারা অপরাপর ইসলামী রাষ্ট্রের উপর মিশরের এক মর্যাদা লাভ হইবে। সৌদী আরব ইহার বিরোধীতা করিয়া প্রচার করিল যে, এই আন্দোলন ইংরেজদের ইঙ্গিতে হইতেছে। মুসলিম দুনিয়ার খলীফা হইবার অধিকার কাহারো থাকিলে, সে অধিকার আরবের বাদশাহ্‌র সর্বাধিক। খেলাফত এমন এক প্রতিষ্ঠান যে, উহার দ্বারা সমস্ত মুসলমান একত্রিত হইয়া যায়। কিন্তু তখন অপরাপর বাদশাহ্‌গণ সাথে সাথে প্রমাদ গুণিতে থাকে যে, তাহাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বুঝি বা হস্তক্ষেপ হইয়া যায়। এই জন্যই এই আন্দোলন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই আন্দোলন যখন জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্টি হয় এবং উহার পিছনে ধর্মের প্রেরণা কাজ করে, তখন কোন রাষ্ট্রীয় বাধা ইহার পথ রোধ করিতে পারে না। একমাত্র জামা'তী বাধাই ইহার পথ রোধ করিতে পারে।

কোন দেশের রাষ্ট্রপতি খেলাফতের দাবী করিলে, অন্যান্য রাষ্ট্রের বিরোধিতার ফলে খেলাফতের আন্দোলন উক্ত রাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইবে। কিন্তু জামা'তের বিরোধিতা হওয়া সত্ত্বেও আন্দোলন কোন দেশেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না। প্রত্যেক দেশেই উহা পৌঁছিবে, উহা প্রসার লাভ করিবে এবং শিকড় গাড়িয়া বসিবে; এমনকি যেসব দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা নাই সেখানেও উহা সাফল্য লাভ করিবে। কারণ কোন রাষ্ট্রীয় বাধা না থাকার ফলে প্রথম প্রথম কোন রাষ্ট্রই ইহার বিরোধিতা করিবে না। আহ্মদীয়াতের ইতিহাস একথার সাক্ষ্য। আহ্মদীয়াতের উদ্দেশ্য মুসলমানদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠিত করা। প্রভুত্ব লাভ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ইংরেজগণ নিজেদের সাম্রাজ্যে সময়ে সময়ে আহ্মদীদিগকে বিড়ম্বনা দিয়াছে সত্য; কিন্তু যেহেতু ইহা নিছক ধর্মীয় আন্দোলন সেইজন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কখনও সরকারীভাবে ইহাকে বাধা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই। মোল্লাদিগের চাপে আফগান সরকার সময় সময় আহ্মদীদের উপর অত্যাচার করিয়াছে সত্য; কিন্তু আফগান বাদশাহ্গণ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে ইহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং অনুতাপও করিয়াছেন। অনুরূপভাবে, অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের জনসাধারণ, উলেমা এবং উহাদের ভয়ে ভীত হইয়া সরকারপক্ষ, কোন কোন সময়ে বাধার সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু কোন সরকার এই চিন্তা করে নাই যে, এই আন্দোলন তাহাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে উৎখাত করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছে। তাহাদের এরূপ চিন্তা না করা ঠিক ছিল।

রাজনীতি করা আহ্মদীদের উদ্দেশ্য নহে। আহ্মদীয়াত প্রতিষ্ঠার একমাত্র উদ্দেশ্য মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থার সংস্কার করা এবং তাহাদিগকে একসূত্রে বাঁধিয়া দেওয়া, যেন তাহারা সম্মিলিত ভাবে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অস্ত্রের দ্বারা মোকাবিলা করিতে পারে। এই উদ্দেশ্য লইয়া আহ্মদী প্রচারকগণ আমেরিকা যায়। এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে সে দেশে যতখানি বিরোধিতা রহিয়াছে, উহার অতিরিক্ত কিছু আমেরিকাবাসীরা আহ্মদী প্রচারকদের বিরুদ্ধে করে নাই। ধর্মীয় আন্দোলনের প্রশ্নে তাহারা মোটেই কোন বিরোধিতা করে নাই। ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ সরকারও এই নীতিই গ্রহণ করিয়াছিল।*[এই পুস্তিকা

যখন লিখিত হয় তখন ডাচগণ (ওলন্দাজ) ইন্দোনেশিয়ার শাসক ছিল] যখন তাহারা দেখিল যে, রাজনীতির ব্যাপারে আহ্‌মদীরা নাক গলায় না, তখন তাহারা আহ্‌মদীদের সম্বন্ধে গোপনে সংবাদ লইতে থাকে এবং তাহাদিগকে অবহেলার চক্ষে দেখিতে থাকে। কিন্তু সরকারীভাবে তাহাদের বিরোধিতা করার কোন প্রয়োজনই অনুভব করে নাই। তাহাদের দিক দিয়া এই ব্যবহার ন্যায্য ছিল। আমরা তাহাদের রাষ্ট্রীয় কাজে প্রত্যক্ষভাবে দখল না দেওয়ায়, তাহারা সরকারীভাবে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। ইহার ফলে আজ প্রায় সকল দেশে আহ্‌মদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশ, আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, প্যালেস্তাইন, মিশর, ইটালী, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি প্রত্যেক দেশেই ছোট বড় জামা'ত প্রতিষ্ঠিত।* এমন না যে, সেখানে কতক এতদ্দেশীয়রা আহ্‌মদী হইয়া গিয়াছে। সেখানকার এমন নিষ্ঠাবান অধিবাসীরা আহ্‌মদী হইয়াছে, যাহারা ইসলামের সেবার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন।

জনৈক ইংরেজ লেফটেন্যান্ট নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া মোবাল্লেগ হিসাবে ইংল্যান্ডে কাজ করিতেছেন। তিনি নিয়মিত নামায পড়েন এবং মদ স্পর্শ করেন না। নিজ শ্রমে অর্জিত পয়সা দ্বারা তিনি প্রচারপত্র ছাপাইয়া বিলি করেন ও সভা সমিতি করিয়া থাকেন। তাঁহাকে আমরা যে ভাতা দিয়া থাকি, ইংল্যান্ডের বহু দিন-মজুরও তদাপেক্ষা অধিক রোজগার করিয়া থাকে।

অনুরূপভাবে জনৈক জার্মান সামরিক অফিসারও নিজ জীবন ওয়াক্‌ফ করিয়াছেন। বহু চেষ্টার পর তিনি জার্মানী হইতে বাহিরে আসিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার সুইজারল্যান্ডে পৌঁছিবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং তথায় তিনি ভিসার অপেক্ষায় আছেন। তিনি ইসলামের সেবা করিবার অপরিসীম উদ্যম অন্তরে পোষণ করেন এবং এই জন্য তিনি পাকিস্তানে

---

*এটি ১৯৪৮ সালের রচনা। পরবর্তিতে জামাত আহমদীয়া পৃথিবীর আরও বহু দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। - প্রকাশক

আসিতেছেন। * (তিনি পাকিস্তানস্থ রাবওয়ায় আসিয়া শিক্ষা সমাপন করিয়া বর্তমানে আমেরিকায় মোবাল্লেগ পদে নিযুক্ত আছেন।) এখানে আসিয়া ইসলামের পূর্ণ শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি বিভিন্ন দেশে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিবেন। জার্মানবাসী অপর একজন যুব-লেখক এবং তাঁহার বিদুষী স্ত্রীও নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। খুব সম্ভব তাঁহারা অতি সত্বরই এই বিষয়ে মীমাংসা করিয়া ইসলামী শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান আসিবেন।

হল্যান্ডের একজন যুবকও ইসলামের সেবার জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিতে মনস্থ করিয়াছেন এবং তিনি সম্ভবতঃ শীঘ্রই কোন এক দেশে প্রচারকের কাজে লাগিয়া যাইবেন।

জামা'তে আহ্মদীয়া একটি ক্ষুদ্র জামা'ত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবে যে, এই ক্ষুদ্র জামা'ত দ্বারাই ইসলামী জামা'ত কায়েম হইতে চলিয়াছে।

প্রত্যেক দেশে কিছু সংখ্যক লোক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া এক বিশ্ব মিলনের ভিত্তি স্থাপন করিতেছে। সকল শ্রেণীর রাজনৈতিক মতবাদীর মধ্য হইতেই কিছু কিছু লোক ইহাতে আসিয়া শামিল হইতেছে।

এই সমস্ত আন্দোলনের সূচনা ক্ষুদ্রাকারেই হইয়া থাকে, কিন্তু সময়ে ইহা ত্বরিত শক্তি সঞ্চয় করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে একতা এবং মিলনের বীজ বপনে কৃতকার্য হইয়া যায়। যেমন রাজনৈতিক শক্তি লাভের জন্য রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তেমনি নৈতিক ও ধর্মীয় শক্তি লাভের জন্য দরকার হয় নৈতিক, ধর্মীয় দল গঠনের। এই কারণেই জামা'তে আহ্মদীয়া রাজনীতি হইতে দূরে থাকে, কারণ ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে পরিণামে তাহারা নিজ কাজে অলস হইয়া পড়িবে।

আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রোগ্রাম

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল প্রোগ্রামেরঃ- এখন ইসলামে, কেবল মাত্র জামা'তে আহ্মীয়ারই সম্মিলিত প্রোগ্রাম আছে এবং অন্য কোন সংগঠনের সম্মিলিত

প্রোগ্রাম নাই। খৃষ্টীয় ধর্মের আক্রমণের সঠিক রূপও গুরুত্ব নির্ণয় করিয়া প্রত্যেক দেশে জামা'তে আহ্‌মদীয়া উহার সহিত শক্তি পরীক্ষায় নিয়োজিত রহিয়াছে। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দুর্বল অংশ এবং এক হিসাবে সর্বপেক্ষা শক্তিশালী অংশ হইতেছে আফ্রিকা। খৃষ্টানগণ তাহাদের সর্ব শক্তি দিয়া আফ্রিকায় অভিযান চালাইয়াছে এবং প্রকাশ্যভাবে তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে। ইতিপূর্বে কেবল পাদরীদের মনোযোগ এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। পরে ইংল্যান্ডের রক্ষণশীলদের দৃষ্টি এই দিকে পড়িয়াছে এবং শ্রমিক পার্টিও ঘোষণা করিয়াছে যে, ইউরোপের মুক্তি, আফ্রিকার উন্নতি ও অগ্রগতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আফ্রিকার উন্নতি ও অগ্রগতি ইউরোপের পক্ষে উপকারী বলিতে ইউরোপ মনে করিত সমস্ত আফ্রিকাবাসীকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করা। চব্বিশ (২৪) বৎসর পূর্বে আহ্‌মদীয়া জামা'ত খৃষ্টানদের এই দূরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে নিজেদের মোবাল্লেগ পাঠাইয়া দেয়। ফলে হাজার হাজার আফ্রিকাবাসী খৃষ্ট ধর্ম ত্যাগ করিয়া ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে। বর্তমানে আফ্রিকায় সর্বাপেক্ষা সুশৃঙ্খল ইসলামী জামা'ত হইতেছে আহ্‌মদীয়াতের। আহ্‌মদীয়া জামা'তের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে খৃষ্টানগণ এখন ইতস্ততঃ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের সকল পত্রিকায় এই কথা প্রকাশিত হইতেছে যে, আহমদীয়া জামা'ত তাহাদের সকল পরিশ্রম পন্ড করিয়া দিয়াছে। পূর্ব আফ্রিকাতেও এই তবলীগের কাজ মাত্র কয়েক বৎসর যাবত চলিয়া আসিতেছে। সেখানে এখনও কাজের সূচনা মাত্র। সেই জন্য সেখানে পশ্চিম আফ্রিকার ন্যায় উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ সম্ভব হয় নাই। অবশ্য, সেখানেও অনেক খৃষ্টান ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। আশা করা যায় যে, মোবাল্লেগদের চেষ্টায় খোদা চাহেন তো কয়েক বৎসরের মধ্যেই আরও সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাইবে। বর্তমানে সেখানে কাজে দ্রুত উন্নতি দেখা যাইতেছে। ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়াতেও আমাদের মিশন স্থাপিত হইয়াছে এবং ইসলামের দলত্যাগীদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া একত্রিত করিয়া শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করিবার জন্য খাড়া করার চেষ্টা করা হইতেছে।

খৃষ্টান শক্তি সমূহের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা অগ্রবর্তী। বিগত

২৪ বৎসর যাবত সেখানেও আহ্‌মদী মোবাল্লেগরা কাজ করিতেছে। ফলে হাজার হাজার আমেরিকাবাসী আহ্‌মদীয়াতে দাখিল হইয়াছে এবং ইসলামের সাহায্যের জন্য প্রতি বৎসর হাজার হাজার ডলার ব্যয় করিতেছে। আমেরিকার ঐশ্বর্য্যের তুলনায় ইহা কিছুই নয় এবং তথাকার পাদরীদের চেষ্টার তুলনায় আমাদের কর্মতৎপরতা অতি নগণ্য। কিন্তু বক্তব্য এই যে, আমরা সেখানে মোকাবিলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছি এবং সাফল্য আমাদেরই হইতেছে। কারণ খৃষ্টান সম্প্রদায় হইতে লোকদিগকে আমাদের জামা'তে আনিতেছি। খৃষ্টানগণ আমাদের জামা'ত হইতে কাহাকেও তাহাদের দলভুক্ত করিতে সক্ষম হইতেছে না।

অতএব, একথা বলা সমীচীন হইবে না যে, আহ্‌মদীগণ নুতন জামা'ত কেন স্থাপন করিল, বরং বলা উচিৎ যে, আহ্‌মদীগণ একটি জামা'ত স্থাপন করিয়াছে, যাহা ইতিপূর্বে ছিল না। ইহা আপত্তি করিবার বিষয়, না প্রশংসনীয় বিষয়?

আহ্‌মদীগণকে অপর সকল হইতে পৃথক রাখিবার কারণ

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, পৃথক জামা'ত গঠনের কি প্রয়োজন ছিল। শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলি মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করিলেই চলিত। এই প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ উত্তর হইতেছে যে, একজন কমান্ডার ঐ সকল লোককেই যুদ্ধে যাইতে আদেশ করিতে পারেন, যাহারা যথারীতি সৈনিকের দলে ভর্তি হইয়াছে। কিন্তু যাহারা সৈনিকের দলে ভর্তি হয় নাই তাহাদিগকে কেমন করিয়া তিনি যুদ্ধে যাইবার আদেশ দিতে পারেন? যদি কোন জামা'ত গঠন না করা হইত তাহা হইলে আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা কাহার দ্বারা কাজ লইতেন? তিনি কাহাকে আদেশ দিতেন এবং তাঁহার খলীফাগণই বা কাহার দ্বারা কাজ করাইতেন বা কাহাকে আদেশ করিতেন? তিনি কি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং মুসলমানদিগকে ধরিয়া ধরিয়া বলিতেন যে, ইসলামের জন্য আজ তোমার অমুক দেশে যাইবার প্রয়োজন আছে, তুমি তথায় গমন কর এবং উত্তরে সে বলিত যে, আমি আপনার কথা মানিতে বাধ্য নহি, পরে তিনি অপর একজনকে যাইয়া

বলিতেন, তৎপর এইরূপ আর একজনকে যাইয়া ধরিতেন এবং প্রত্যেকেই অস্বীকার করিত?

যুক্তির কথা হইতেছে, স্থায়ী এবং সুসংবদ্ধভাবে কোন কাজ করিতে হইলে জামা'ত থাকার একান্ত প্রয়োজন আছে। জামা'ত ব্যতীত কোন মহান কাজ সুষ্ঠুরূপে সমাধা হইতে পারে না।

কেহ হয় তো বলিতে পারেন, জামা'ত গঠন করিবার পরও তো সকলে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারি। উত্তরে বলিব যে, এক পাগল ছাড়া অন্য কেহ জানিয়া শুনিয়া বাঘের মুখে হাত দিতে রাজী হইবে না। কাজেই এহেন পাগলদিগকে বিচক্ষণ লোক হইতে পৃথক করিয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন; কারণ যদি বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এই পাগলদিগকে নিজেদের মত করিয়া গড়িয়া তোলে, তবে এই সমস্ত পাগলামীর কাজ কে করিবে? অপর সকল হইতে পৃথক থাকার ফলে তাহাদের চরিত্রের মধ্যে আপনা আপনি এক বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠে যাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অপর সকলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। যাহাকে তাহারা নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল, পরিণামে একদিন নিজেরাই তাহার শিকার হইয়া যায়। মোট কথা, আপত্তির কারণ হইল বিষয়টি তলাইয়া না দেখা।

বিবেক বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইলে তাহারা বুঝিতে পারিত যে, আহ্‌মদীগণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছে উহা সঠিক এবং নির্ভুল; এই সঠিক পন্থা অবলম্বন করিয়াই আহ্‌মদীয়া জামা'ত ইসলামের জন্য জীবন-উৎসর্গকারীদের একটি দল গঠন করিয়াছে এবং যতদিন পর্যন্ত তাহারা এই নিয়মে চলিতে থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত এই ধরণের লোকের সংখ্যা প্রত্যহ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। শেষে কাফেরগণ মনে করিবে যে, ইসলাম এখন শক্তিশালী হইয়া পড়িয়াছে এবং সমস্ত শক্তি লইয়া তাহারা ইসলামের উপর আক্রমণ করিবে। কিন্তু তখন দেখা যাইবে, তাহাদের সময় গত হইয়া গিয়াছে। ইসলামের বিজয় হইবে। কুফর পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।

আমরা কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করি না। বরং তাহাদিগকে ইহাই বলি যে, যে পর্যন্ত আমাদের বক্তব্য তাহারা

অনুধাবন না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা নিজ কর্তব্য করিয়া যাউক এবং আমাদের কাজে তাহারা বাধা সৃষ্টি না করুক। যে তাহাদের কাজ ভাল মনে করে সে তাহাদের সঙ্গে যোগদান করুক এবং যে আমাদের কাজকে ভাল মনে করে সে আমাদের সঙ্গে যোগদান করুক। তাহাদের পথে আত্মত্যাগ অল্প এবং প্রচারণা বেশী এবং আমাদের পথে ত্যাগ অধিক, প্রচারণা অল্প। তাহারা তাহাদের কাজের ফল পাইবে এবং আমরা আমাদের কাজের ফল পাইব। ইসলামের প্রতিষ্ঠা যাহাদের কাম্য, তাহারা আমাদের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইবে এবং যাহারা পার্থিব রাজত্বের জন্য লালায়িত তাহারা ঐ দলে যাইয়া মিলিত হইবে। আমরা পরস্পর কেন বিবাদ করি। জাতির জন্য আমরা উভয়ে ব্যথিত। হয়তো ব্যথা বিভিন্ন অঙ্গে। তাহাদের বেদনা শিরে এবং আমাদের বেদনা অন্তরে।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমি বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিষয়টির উত্তর দিয়া আসিয়াছি। এখন আমি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিষয়টির উত্তর দিব। ইহা আল্লাহ্ তা'লার চিরাচরিত নিয়ম যে, যখনই পৃথিবীতে অন্যায় বৃদ্ধি পায় তখনই পৃথিবী হইতে আধ্যাত্মিকতা লোপ পায়। মানুষ অধর্মকে ধর্মের উপর প্রাধান্য দান করে। তখন আল্লাহ্ তা'লা মানবের হেদায়াত ও সৎপথ প্রদর্শনের জন্য কোন মনোনীত ব্যক্তিকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া থাকেন, যিনি পথ ভ্রান্ত মানুষকে সৎপথে ফিরাইয়া আনেন এবং আল্লাহ্র প্রেরিত ধর্মকে পুনঃ পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কোন কোন সময় এই প্রেরিত মহাপুরুষগণ ধর্ম-বিধান আনয়ন করেন, আবার কোন কোন সময় পূর্ববর্তী শরীয়াতকে পুনঃ স্থাপন করেন। পবিত্র কুরআন আল্লাহ্ তা'লার এই সনাতন নিয়মের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে এবং আল্লাহ্ তা'লার এই অনুগ্রহ ও অনুকম্পার নিদর্শনের প্রতি মানব জাতির দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিয়াছে।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আল্লাহ্ তা'লা অসীম ক্ষমতার অধিকারী এবং মানুষ তাহার তুলনায় কীটানুকীট হইতেও অধম। ইহাও সত্য যে,আল্লাহ্ তাআলার প্রত্যেকটি কাজই প্রজ্ঞাপূর্ণ। তিনি কোন কাজ বিনা কারণে এবং উপকারবিহীন ভাবে করেন না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলিতেছেন ঃ

(সূরা দুখান 44 ঃ 39) وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ

অর্থাৎ- আমরা আকাশসমূহ এবং পৃথিবী অহেতুক সৃষ্টি করি নাই, বরং ইহার সৃষ্টিতে কোন উদ্দেশ্য আছে এবং সেই উদ্দেশ্য হইতেছে যে, মানব নিজের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার মহিমার বিকাশ ঘটাইবে এবং তাঁহার প্রকাশক হইয়া, পৃথিবীর যে সমস্ত লোক উচ্চস্তরের চিন্তা করিতে পারে না, তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'লার পরিচয় দান করিবে।

সৃষ্টির আদি হইতে আল্লাহ্ তা'লার এই বিধান চলিয়া আসিতেছে। বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্ তা'লা তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিনিধি দুনিয়াতে প্রেরণ করিয়াছেন। কোন সময় আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে তাঁহার মহিমার বিকাশ হইয়াছে, কখনো নূহ (আঃ)-এর মারফত, কখনো ইবরাহীমি কায়াতে, আবার কোন সময় উহা মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রকাশ পাইয়াছে। কখনো দাউদ (আঃ) খোদাতা'লার জ্যোতিঃ পৃথিবীকে দেখাইয়াছেন এবং কখনো মসীহ্ (আঃ) খোদার আলো নিজ দেহে বিকাশ করিয়াছেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বশেষ এবং পূর্ণাকারে আল্লাহ্ তা'লার সকল গুণরাজী একত্রিত ও বিস্তারিতভাবে এবং একক ও সমষ্টিগত রূপে বিশ্বে এমন প্রতাপ ও প্রতিপত্তির সহিত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পূর্ববর্তী সকল নবী তাঁহার সূর্যবৎ অস্তিত্বের সম্মুখে নক্ষত্রের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছেন।

রসূল করীম(সাঃ)-এর আগমনে সকল শরীয়াতের সমাপ্তি ঘটিয়াছে এবং সর্ব প্রকার শরীয়াত আনয়নকারী নবীদের আগমনের পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহা কোন পক্ষপাতিত্ব নহে বা কাহারও মনতুষ্টির জন্য নহে, বরং নূতন শরীয়তের আগমন এই জন্য বন্ধ হইয়াছে, যেহেতু, আঁ-হযরত (সাঃ) এমন এক শরীয়াত আনিয়াছেন, যাহা শরীয়াতের সকল অভাব ও আবশ্যকতাকে পূর্ণ করিয়াছে। খোদাতা'লার কাছ হইতে যাহা কিছু আসিবার ছিল তাহা পরিপূর্ণরূপে আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু মানুষের জন্য এমন কোন নিশ্চয়তা দান করা হয় নাই যে, তাহারা পথ ভ্রষ্ট হইবে না এবং সত্য শিক্ষাকে ভুলিয়া যাইবে না। বরং পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টরূপে বলিতেছেন ঃ

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۞

(সূরা সিজদা 32 ঃ 6)

অর্থাৎ- আল্লাহ্ তা'লা তাঁহার এই সর্বশেষ কালাম (বাণী) এবং নিজ সর্বশেষ শরীয়াতকে আকাশ হইতে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন এবং মানুষের বিরোধিতা ইহার পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না; কিন্তু পুনঃ কিছু কাল পরে এই কালাম আকাশে উঠিতে থাকিবে এবং এক হাজার বৎসরে ইহা পৃথিবী হইতে উঠিয়া যাইবে ।

আঁ-হযরত (সাঃ) ধর্মের প্রতিষ্ঠার সময়কে তিনশত বৎসর বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন। ইতিপূর্বে হাদীসে ইহার বর্ণনা করা হইয়াছে । পবিত্র কুরআনও الٓمّٓرٰ এর দ্বারা অর্থাৎ আরবী বর্ণমালার আবজদ মান অনুযায়ী এই যুগকে দুই শত একাত্তর (২৭১) বৎসর বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছে এবং ইহার সহিত ধর্মের আকাশে উত্থানের ১০০০ বৎসর সময় যোগ করিলে ১২৭১ হয়। অতএব, দুনিয়া হইতে ইসলামের অন্তর্ধানের সময় কুরআন দৃষ্টে ১২৭১ বৎসর হয়। এই হিসাবে নির্দিষ্ট সময় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পড়ে। পবিত্র কুরআনের নিয়মানুযায়ী ঠিক এমনি সন্ধিক্ষণে খোদার তরফ হইতে নিশ্চয় কোন হাদী বা পথ-প্রদর্শক আসিয়া থাকেন, যেন পৃথিবী চিরকালের জন্য শয়তানের দখলে চলিয়া না যায় এবং খোদাতা'লার রাজত্ব চিরকালের জন্য পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া না যায়। সুতরাং এই সময়ে খোদাতা'লার তরফ হইতে পৃথিবীতে কোন প্রেরিত পুরুষের আগমনের প্রয়োজন ছিল। আগমনকারী যিনিই হউন না কেন উপরোক্ত সময়ে একজন আসার প্রয়োজন।

আদম (আঃ)-এর উম্মতের মধ্যে যখন গ্লানি দেখা দিল, তখন খোদাতা'লা তাহাদের সংশোধনের ব্যবস্থা করিলেন। নূহ্ (আঃ)-এর অনুগামীদের মধ্যে যখন গ্লানি দেখা দিল, খোদাতা'লা তাহাদের সংশোধনের ব্যবস্থা করিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উম্মতের মধ্যে যখন গ্লানি দেখা দিল, খোদাতা'লা তাহাদের সংশোধনের ব্যবস্থা করিলেন। যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর উম্মতের মধ্যে গ্লানি দেখা দিল, তখন খোদাতা'লা তাহাদের সংশোধনের ব্যবস্থা করিলেন। যখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর উম্মতের মধ্যে গ্লানি দেখা দিল, তখন খোদাতা'লা

তাহাদের সংশোধনের ব্যবস্থা করিলেন। অতএব, ইহা কিরূপে সম্ভব যে, নবীকুল শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে গ্লানি দেখা দিলে তিনি তাহাদের সংশোধনের ব্যবস্থা করিবেন না? আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উম্মতের জন্য তো ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্লানি দূর করিবার জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় মুজাদ্দিদ আগমন করিবেন। যেমন রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰہَ یَبْعَثُ لِھٰذِہِ الْاُمَّۃِ عَلٰی رَأْسِ کُلِّ مِائَۃِ سَنَۃٍ مَّنْ یُّجَدِّدُ لَھَا دِیْنَھَا

(ابوداؤد جلد ۲ صفحہ ۲۴۱ کتاب الفتن واصول الکافی صفحہ ۶۹۴)

অর্থাৎ- নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য এমন মহাপুরুষকে আবির্ভূত করিবেন, যিনি তাহাদের জন্য ধর্মকে সঞ্জীবিত করিবেন। (আবু দাউদ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৪১, কিবাতুল ফিত্ন ও উসুলুলকাফি পৃষ্ঠা: ৬৯৪)

সুতরাং কোন সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তি কিরূপে ইহা মানিতে পারেন যে, ক্ষুদ্রাকারের গ্লানি দূর করিবার জন্য তো আল্লাহ্র তরফ হইতে মুজাদ্দিদ আগমন করিবেন, কিন্তু তাহাদের ভীষণ বিপদের সময় কোন মনোনীত ব্যক্তি আসিবেন না, কোন হাদী আসিবেন না এবং কোন পথ-প্রদর্শক আসিবেন না, মুসলমানদিগকে সত্য ধর্মে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত ও একত্রিত করিবার জন্য খোদাতা'লার তরফ হইতে কোন আহ্বান আসিবে না, তাহাদিগকে পাপের অন্ধকার আবর্ত হইতে তুলিবার জন্য আকাশ হইতে কোন রজ্জু নামাইয়া দেওয়া হইবে না? অথচ আঁ-হযরত (সাঃ) এই বিপদ সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ "যখন হইতে পৃথিবীতে নবীগণের সমাগম আরম্ভ হইয়াছে, তখন হইতে তাঁহারা সকলেই এই বিপদ সম্বন্ধে সতর্কবাণী করিয়া আসিতেছেন।" যে খোদা সৃষ্টির আদি হইতে দয়া ও অনুকম্পার নমুনা দেখাইয়া আসিতেছেন, নবী করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাবে তাঁহার সেই দয়া ও অনুকম্পা সমুদ্রাকারে উদ্বেলিত হইয়াছে, নাকি উহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে?

খোদাতা'লা কখনো যদি রহীম ছিলেন, তাহা হইলে মুহাম্মদী উম্মতের জন্য তাঁহার আরও বেশী রহীম হওয়া প্রয়োজন। যদি কোন সময় তিনি

করীম ছিলেন, তবে মুহাম্মদী উম্মতের জন্য এখন তাঁহার আরও অধিক করীম হওয়া প্রয়োজন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এইরূপই। পবিত্র কুরআন এবং হাদীস সাক্ষ্য দিতেছে যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে যখনই গ্লানি আসিবে, খোদাতা'লা নিজের তরফ হইতে হাদী এবং পথ-প্রদর্শক পাঠাইতে থাকিবেন, বিশেষ করিয়া শেষ যুগে যখন দাজ্জালের ফিতনার প্রাদুর্ভাব ঘটিবে, খৃষ্টধর্ম প্রবল হইবে, ইসলাম বাহ্যতঃ পরাভূত হইবে এবং মুসলমানগণ ধর্ম-কর্ম ছাড়িয়া দিবে এবং অন্যান্য জাতির চাল-চলন গ্রহণ করিবে, তখন রসূল করীম (সাঃ)-এর একজন মযহার (পূর্ণ প্রকাশক) আবির্ভূত হইবেন এবং তিনি ঐ যুগের সংস্কার করিবেন। এ সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ

لَا يَبْقٰى مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اِسْمُهٗ وَ لَا يَبْقٰى مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا رَسْمُهٗ

(مشکوٰۃ-کتاب العلم الفصل الثالث صفحہ ۳۷، کنز العمال جلد ۶ صفحہ ۴۳)

অর্থাৎ- ইসলামের শুধু নাম অবশিষ্ট থাকিবে এবং কুরআনের শুধু লেখা থাকিয়া যাইবে। ইসলামের সারবস্তুর কোথাও খোঁজ পাওয়া যাইবে না এবং কুরআনের অর্থ কাহারও মর্মস্পর্শ করিবে না (মিশকাত; কিতাবুল ইল্ম,তৃতীয় অধ্যায় পৃষ্ঠা: ৩৭; কুঞ্জুল উম্মাল,ষষ্ঠ খন্ড পৃঃ ৪৩)।

অতএব, হে প্রিয় বন্ধুগণ! আহ্মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠা সেই চিরন্তন নিয়মানুযায়ীই হইয়াছে। এই সময়ের সম্বন্ধে হযরত নবী করীম (সাঃ) এবং পূর্ববতী নবীগণ যে ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই ঘটিয়াছে।

যদি মির্যা সাহেবের মনোনয়ন ঠিক না হইয়া থাকে, তবে সে অভিযোগ খোদাতা'লার বিরুদ্ধে, মির্যা সাহেবের ইহাতে কি অপরাধ? সব অজানা যদি খোদাতা'লার জানা থাকে, কোন রহস্যই যদি তাঁহার নিকট গোপন না থাকে এবং যদি তিনি প্রজ্ঞাময় হইয়া থাকেন, তবে বুঝিতে হইবে যে, মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর মনোনয়ন নির্ভুল হইয়াছে এবং তাঁহাকে গ্রহণ করাতেই মুসলমান তথা বিশ্বের মঙ্গল। তিনি নুতন কোন সংবাদ আনয়ন করেন নাই। পরন্তু তিনি সেই সংবাদ আনিয়াছেন, যাহা হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দুনিয়াবাসীকে শুনাইয়াছিলেন, কিন্তু

দুনিয়াবাসী তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহা সেই সংবাদ যাহা পবিত্র কুরআন উপস্থাপিত করিয়াছিল, কিন্তু মানব তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। সেই চিরন্তন সংবাদ ইহাই যে, সমগ্র বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা এক এবং অদ্বিতীয় খোদা যিনি প্রেম-ভালবাসার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি নিজ গুণাবলী প্রকাশ করিবার জন্য মানব সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলিতেছেন ঃ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

(সূরা বাকারা 2 ঃ 31)

অর্থাৎ- এবং (স্মরণকর) যখন তোমার প্রভু ফিরিশ্তাগণকে বলিলেন, 'নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিতে চলিয়াছি'।

অতএব, আদম (আঃ) এবং তাঁহার বংশধরগণ খোদাতা'লার খলীফা বা প্রতিনিধি। খোদাতা'লার গুণরাজিকে প্রকাশ করিবার জন্য তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং সমগ্র মানবজাতির কর্তব্য হইতেছে, নিজ জীবনকে খোদাতা'লার গুণে গুণান্বিত করিয়া তোলা। একজন উকিল যেমন প্রতি কাজে নিজ মক্কেলের প্রতি মনোযোগী হয়, একজন দাস যেমন প্রতি পদক্ষেপে প্রভুর দিকে তাকাইয়া থাকে, তেমনি মানুষের কর্তব্য হইতেছে খোদাতা'লার সাথে এমন সম্বন্ধ স্থাপন করা যাহাতে খোদাতা'লা তাহার প্রতি কাজে প্রতি মুহূর্তে তাহাকে পথ প্রদর্শন করেন এবং তিনি যেন তাহার নিকট সব চাইতে প্রিয় হন এবং সে যেন প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার উপর নির্ভরশীল হয়। এই কর্তব্য সাধন করিবার জন্যই হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) আবির্ভূত হইয়াছে। তাঁহার কাজ সংসারাসক্ত জনগণকে ধার্মিক করা, ইসলামের অনুশাসনকে মানব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা, এবং হজরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে পুনঃ তাঁহার আধ্যাত্মিক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা, যে সিংহাসন হইতে তাঁহাকে নামাইবার জন্য শয়তানী শক্তিসমূহ ভিতরে এবং বাহিরে চেষ্টা করিতেছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্ব প্রথম মুসলমানদিগের মনোযোগ খোলসের পরিবর্তে সার পদার্থের দিকে আকর্ষণ করিলেন। তিনি জানাইলেন যে, আদর্শের বাহ্যিক দিকটিও

পালন করা অবশ্য কর্তব্য বটে, কিন্তু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রতি মনোযোগী না হইলে কেবল বাহ্যিক আদেশ পালন করিয়া মানুষ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। তদনুযায়ী তিনি এক জামা'ত স্থাপন করিলেন এবং বয়আত নামায় এই শর্ত রাখিলেন যে, **'আমি ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিব।'**

প্রকৃত পক্ষে পার্থিবতার ব্যাধিই মুসলমানদিগকে ঘুণের মত খাইয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেছিল। দুনিয়া তাহাদের হাত ছাড়া হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর দিকেই তাহাদের নজর ছিল। ইসলামের উন্নতির অর্থে তাহারা রাজত্ব লাভ করা মনে করিত এবং ইসলামের সফলতার অর্থে তাহারা তথাকথিত মুসলমানগণের শিক্ষা এবং বাণিজ্যিক উন্নতি মনে করিত। অথচ রসূল করীম (সাঃ) পৃথিবীতে এই জন্য আসেন নাই যে, মানুষ নিজদিগকে কেবল মুসলমান বলিবে। বরং তিনি আসিয়াছিলেন সকলকে সেইরূপ খাঁটি মুসলমান বানাইতে যেরূপ মুসলমানের ব্যাখ্যা পবিত্র কুরআনে আসিয়াছে ঃ

(সূরা বাকারা 2 ঃ 113) مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ

অর্থাৎ- যে নিজের সত্তাকে খোদাতা'লার জন্য উৎসর্গ করিয়া দেয় এবং নিজ পার্থিব প্রয়োজনকে ধর্মীয় প্রয়োজনের অধীনে রাখে ।

বাহ্যতঃ ইহা অতি তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য ইহাই যে, ইসলাম কখনও একথা বলে না যে, তুমি বিদ্যা শিক্ষা করিও না বা কোন কলা কৌশল শিখিও না, উহা একথাও বলে না যে, তুমি নিজ রাজ্যকে শক্তিশালী করিও না। ইসলাম মানুষের শুধু দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে। পৃথিবীর যাবতীয় কাজের দুইটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে; প্রথম, খোসার দ্বারা শাঁস লাভ করার দৃষ্টিভঙ্গি দ্বিতীয়, শাঁস দিয়া খোসা লাভ করার দৃষ্টিভঙ্গি। যে ব্যক্তি খোসা লাভ করিতে চায়,তাহার শাঁস পাইবার কোন নিশ্চয়তা নাই। অধিকাংশ সময় সে বিফল হয়। কিন্তু যে শাঁস লাভ করে, সে শাঁস সহ খোসাও পাইয়া থাকে। রসূল করীম (সাঃ) এবং তাঁহার অনুগামীদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ছিল ধর্মের জন্য; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা পার্থিব বিষয়

হইতে বঞ্চিত হন নাই। ইহা স্বাভাবিক কথা যে, যাহারা ধর্মীয় বিষয়ে সফলতা লাভ করিবে, দুনিয়া কৃতদাসীর ন্যায় তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আসিবে। কিন্তু পার্থিব সফলতার মাধ্যমে পারলৌকিক সফলতা লাভের সম্ভাবনা কম। অধিকাংশ সময় ইহা তো হয়ই না, বরং ধর্মেও সামান্য যাহা কিছু থাকে, তাহাও হারাইতে হয়।

সুতরাং হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) নবীদের পদাঙ্ক অনুসরণে, খোদার নির্দেশ অনুযায়ী, ধর্মের প্রতি গুরুত্ব দান করিতে লাগিলেন। তাঁহার আবির্ভাবে মুসলমানদের মধ্যে দুই প্রকারের আন্দোলন চলিতে লাগিল। প্রথম আন্দোলন ছিলঃ মুসলমানগণ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তাহাদিগের পার্থিব শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করা উচিত। দ্বিতীয় আন্দোলন ছিলঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) প্রবর্তিত। তিনি বলিলেন যে, আমাদিগকে ধর্মের দিকে মনোযোগী হইতে হইবে। ইহার নিশ্চিত পরিণাম হইবে যে, খোদাতা'লা নিজ হইতেই আমাদিগকে পার্থিব সম্পদ দান করিবেন।

ইহাতে অনেকেই ভুল বুঝিলেন যে, তাঁহার আন্দোলন বুঝি আজকালের সুফীগণের ন্যায়, যাহারা বাহ্যিকভাবে রোযা নামাযের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া সুস্থ, সক্ষম লোকদিগকে পর্দানশীন স্ত্রীলোকদের ন্যায় নির্জনবাসে বসাইয়া দেয়। এরূপ হইলে তাহার আন্দোলনও শাঁসের নামে খোসার জন্য হইত; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তিনি যেখানেই ধর্মের প্রতি জোর দিয়াছেন, সেখানে তিনি একথার উপরও জোর দিয়াছেন যে, মানবের মেধাকে উদ্দীপ্ত, মস্তিষ্ককে আলোকিত এবং বুদ্ধিকে তীক্ষ্ম করিবার জন্যই ধর্মের আগমন হইয়া থাকে। তিনি আরও বলিয়াছেন, যে সততার সহিত ধর্মকে পালন করে এবং কৃত্রিমতাকে পরিহার করিয়া চলে, ধর্ম তাহার মধ্যে মহান চরিত্রের সৃষ্টি করে, কর্মশক্তি দেয় এবং আত্মত্যাগ ও পরোপকারের প্রেরণা যোগায়। তিনি আরও বলিয়াছেন, তুমি ধর্মকে গ্রহণ কর, নামায পড়, রোযা রাখ, হজ্জ কর, যাকাত দান কর; কিন্তু সেই নামায পড় যাহা কুরআন বলে এবং সেই রোযা রাখ যাহা কুরআন শিক্ষা দেয় এবং সেই হজ্জ পালন কর ও সেই যাকাত দাও যাহা কুরআন বলে। কুরআন করীম তোমাকে নিছক উঠা বসা করিতে বলে

না, অনর্থক অনাহারে থাকিতে বলে না, মিছামিছি নিজ দেশ ত্যাগ করিতে বলে না এবং নিজ ধন-দৌলত নষ্ট করিতে বলে না। পবিত্র কুরআনে নামায সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنۡهٰی عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَالۡمُنۡکَرِ ؕ وَلَذِکۡرُ اللّٰهِ اَکۡبَرُ ؕ وَاللّٰهُ یَعۡلَمُ مَا تَصۡنَعُوۡنَ

(সূরা আনকবূত 29 ঃ 46)

অর্থাৎ- নামায তোমাকে অশ্লীলতা এবং বিশ্বাসহীনতা হইতে মুক্ত করে। সুতরাং নামায পড়া সত্ত্বেও যদি তুমি ঐ দোষ হইতে মুক্ত না হও, যে ভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে, তবে তোমার নামায প্রকৃত নহে। রোযা সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলিতেছেন যে,

لَعَلَّکُمۡ تَتَّقُوۡنَ

(সূরা বাকারা 2 ঃ 184)

অর্থাৎ- রোযার বিধান এই জন্য দেওয়া হইয়াছে যে, রোযা রাখিয়া যেন তোমার মধ্যে নিষ্ঠা ও উত্তম চরিত্র জন্মে। সুতরাং তুমি রোযা রাখিয়া যদি এই ফল না পাও, তবে বুঝিতে হইবে যে, তোমার উদ্দেশ্য সৎ নহে, তুমি রোযা রাখ নাই, শুধু অনাহারে ছিলে এবং তোমার অনাহারে থাকা আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রেত ছিল না। হজ্জ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'লা বলিয়াছেন, উহা দেশদ্রোহিতার মনোভাব এবং আত্মকলহ ও বিবাদ- বিসংবাদকে বিদূরিত করে। অতএব, হজ্জের বিধান আত্মকলহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তিকে দূর করিবার জন্য। যাকাত সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'লা বলিতেছেনঃ

خُذۡ مِنۡ اَمۡوَالِهِمۡ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَکِّیۡهِمۡ بِهَا

(সূরা তওবা 9 ঃ 103)

অর্থাৎ- যাকাত ব্যক্তি ও জাতিকে সংশোধিত করে এবং অন্তর ও চিন্তাকে পবিত্র করে ।

সুতরাং যে পর্যন্ত এই সব ফল না পাওয়া যায়, সে পর্যন্ত তোমার হজ্জ এবং যাকাত লোক দেখানো বস্তু। সুতরাং তুমি নামায পড়, রোযা রাখ, হজ্জ কর, যাকাত দাও; কিন্তু আমি তোমার নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতকে তখনই মানিয়া লইব, যখন দেখিব যে, ঐ সকল কাজের

নির্দিষ্ট ফল তোমার হাসিল হইয়াছে এবং তুমি অশ্লীলতা ও অবিশ্বাস হইতে মুক্ত হইয়াছ, তোমার মধ্যে ন্যায় নিষ্ঠার সৃষ্টি হইয়াছে, তুমি কলহ-বিবাদ ও অশান্তি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছ, তোমার অন্তর ও চিন্তার মধ্যে পবিত্রতা আসিয়াছে এবং ব্যক্তি ও জাতিগতভাবে তোমাদের সংশোধন হইয়াছে। কিন্তু যাহার মধ্যে এই সকল গুণ পাওয়া না যাইবে, আমি তাহাকে আমার জামা'তভুক্ত মনে করব না-কারণ সে খোসা গ্রহণ করিয়াছে, শাঁস গ্রহণ করে নাই, যাহা গ্রহণ করা তাহার জন্য খোদাতা'লার অভিপ্রেত ছিল।

এই ভাবে বাদ বাকী ইবাদত সম্বন্ধেও তিনি সার বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ইসলামের কোন নির্দেশই অকারণ নয়। খোদাতা'লা চর্ম চক্ষে দৃষ্টিগোচর হন না। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করা যায়। খোদাতা'লা কে হাত দ্বারা স্পর্শ করা যায় না । কিন্তু ভালবাসার দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করা যায়। অতএব, ধর্মের উদ্দেশ্য শুধু হাত ও চক্ষের উপর কর্তৃত্ব করা নহে, বরং যখনই উহা হাত এবং চক্ষুকে চালনা করে, তখনই হৃদয় ও চিন্তাধারাকে পবিত্র করিবার জন্য চালনা করে। যাহাতে মানুষের অন্তরে এমন শক্তি সৃষ্টি হয়, যাহার দ্বারা সে খোদাতা'লাকে দেখিতে পায়,তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে এবং তাঁহার বাণী শুনিতে পারে।

সুতরাং এই সকল বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়া ইসলামের উন্নতির জন্য একটি পথ বাহির করিয়াছেন। ফলে একটি ক্ষুদ্র জামা'তের সৃষ্টি হইয়াছে এবং উহা এমন জামা'ত, যাহা ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিয়াছে এবং ইসলামের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক রাজত্ব স্থাপনের জন্য সর্বপ্রকার আত্মত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন, কোথায় এক ক্ষুদ্র আহ্মদী জামা'ত আর কোথায় সমস্ত মুসলমানদের এক বিরাট দল। কিন্তু ইসলামের উন্নতি এবং প্রচারের জন্য আহ্মদীয়া জামা'ত যাহা কিছু করিতেছে, তাহার তুলনায় সহস্রগুণে সংখ্যাগুরু অবশিষ্ট মুসলমানের দল উহার অর্ধেক বা এক-চতুর্থাংশ কাজও কি করিতেছে? কেন এই পরিবর্তন ঘটিল? একমাত্র

এই কারণে যে, হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) আহ্মদীগণকে শিক্ষা দিয়েছেন যে,ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দাও। আহ্মদীগণ ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়াছে, তাই তাহাদের সাধনা এক নতুন ধারায় চালিত হইয়াছে। একজন প্রকৃত আহ্মদী যে নামায পড়ে, একজন সাধারণ মুসলমান সে নামায পড়ে না। নামাযের আকার উভয়ের একই। নামাযের কলেমাগুলি এক, কিন্তু শাঁস ভিন্ন। আহ্মদীগণ নামায পড়ে নামায হিসাবে এবং আল্লাহ্তা'লার সহিত ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপনের জন্য। হয়ত কেহ বলিতে পারে ঃ "তবে কি অন্যরা খোদার সহিত নৈকট্য বৃদ্ধির জন্য নামায পড়ে না?" উত্তরে আমি বলিব, কখনও না। আপনি একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, দুর্ভাগ্যবশতঃ ইদানিং মুসলমানদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হইতেছে যে, খোদাতা'লার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সৃষ্টি হইতে পারে না। সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে এই ভুল ধারণা জন্মিয়াছে যে, খোদাতা'লা এখন আর বান্দার সহিত কোন বাক্যালাপ করেন না এবং বান্দা খোদাতা'লাকে কোন কথা মানাইতে সক্ষম নহে। শতাধিক বৎসর হইতে মুসলমানগণ খোদাতা'লা হইতে ইল্হাম অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়ে অবিশ্বাসী হইয়াছে। ইতিপূর্বে মুসলমানদের মধ্যে ঐ সকল লোক ছিলেন, যাঁহারা ওহী ইলহাম অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়ে অবশ্যই বিশ্বাস রাখিতেন। শুধু বিশ্বাসই করিতেন এমন নহে বরং তাহারা দাবী করিতেন যে, খোদাতা'লা তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিয়া থাকেন। কিন্তু শতাব্দী কাল যাবৎ মুসলমানদের উপর এই বিপদ নামিয়াছে যে, খোদার বাণী প্রচলিত থাকা তাহারা এখন সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া বসিয়াছে। এমন কি কোন কোন আলেম সত্যের প্রকাশকে কুফরী সাব্যস্ত করিয়াছেন। হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) আগমন করিয়া পৃথিবীময় প্রচার ও দাবি করিলেনঃ "খোদাতা'লা আমার সঙ্গে কথা বলেন।" তিনি আরও বলিলেনঃ "যাহারা আমার অনুগমন করিবে, আমার পদাঙ্কানুসরণ করিবে ও নির্দেশ মান্য করিবে, খোদাতা'লা তাহাদের সঙ্গেও কথা বলিবেন।" তিনি অবিরামভাবে খোদাতা'লার নিকট হইতে প্রাপ্ত বাণী পৃথিবীর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং স্বীয় অনুগামীদিগকে অনুপ্রাণিত করিলেন, যেন তাহারা খোদাতা'লার নিকট হইতে এই পুরস্কার পাইতে চেষ্টা করে।

তিনি বলিয়াছেন, মুসলমান দৈনিক পাঁচ বার খোদাতা'লার নিকট এই প্রার্থনা করিয়া থাকে–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

(সূরা ফাতেহা 1 ঃ 6-7)

অর্থাৎ– 'হে খোদা! তুমি আমাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথ দেখাও ঐ সকল লোকেদের পথ, যাহাদেরকে তুমি পুরস্কার দিয়াছ (অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণের পথে পরিচালিত কর) । অতএব, ইহা কেমন করিয়া সম্ভবপর যে, মুসলমানদের এই দোয়া চিরকাল ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং তাহাদের মধ্য হইতে কাহারও জন্য উপরোক্ত রাস্তা খোলা হইবে না যাহা পূর্ববর্তী নবীদের জন্য খোলা হইয়াছিল এবং খোদাতা'লা পূর্ববর্তী নবীদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলিতেন, অনুরূপভাবে আর কাহারও সঙ্গে কথা বলিবেন না? মুসলমানদের অন্তরে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তিনি তাহা এই উপায়ে সম্পূর্ণভাবে দূর করিলেন। আমি বলি না যে, প্রত্যেক আহ্‌মদীর সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য, বরং আমি বলি যে, প্রত্যেক আহ্‌মদী যে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর শিক্ষাকে সম্যক উপলব্ধি করিয়াছে, সে শুধু ফরয আদায়ের জন্য নামায পড়ে না, বরং সে নামায এমন গভীরভাবে পড়ে যেন সে খোদাতা'লার নিকট কিছু পাওয়ার আশায় নামাযে দাঁড়াইয়াছে। নিজের আন্তরিকতা দ্বারা খোদাতা'লার সহিত এক নতুন সম্বন্ধ সৃষ্টি করিতে খোদার কাছে উপস্থিত হইয়াছে। ইহা সহজেই অনুমেয় যে, এই মনোভাব লইয়া যে ব্যক্তি নামায পড়ে, তাহার নামায এবং অপরের নামায এক ও সমান হইতে পারে না।

খোদাতা'লার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের উপর ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়াছেন এবং বলিয়াছেনঃ "আমার দাবী মানিবার স্বপক্ষে খোদাতা'লা বহু প্রমাণ দিয়াছেন। কিন্তু আমি তোমাকে এ কথা বলি না যে, তুমি কেবল ঐগুলি চিন্তা করিয়া দেখ এবং বুঝিতে চেষ্টা কর। যদি প্রমাণসহ চিন্তা করিয়া দেখিবার ও বুঝিবার সুযোগ না পাও, কিংবা ইহার প্রয়োজনবোধ না কর অথবা যদি মনে কর তোমার বিবেক ইহার সঠিক মীমাংসা করিতে ভুল করিতে পারে, তবে তোমার মনোযোগ আর এক দিকে আকর্ষণ করিতেছি। তুমি খোদার কাছে আমার বিষয়ে দোয়া কর

এবং খোদাতা'লার নিকট সঠিক নির্দেশ প্রার্থী হও এবং বলঃ "হে খোদা! এই ব্যক্তি যদি সত্যবাদী হন, তবে আমাকে সত্য পথ দেখাওঃ কিন্তু যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে আমাকে তাহার নিকট হইতে দূরে রাখ।" তিনি বলিয়াছেন যদি কেহ সত্য মন লইয়া এবং বিদ্বেষমুক্ত হইয়া খোদার নিকট এইভাবে কিছু দিন দোয়া করে, তবে নিশ্চয় তাহার জন্য হেদায়াতের দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং আমার সত্যতা তাহার নিকট দেদীপ্যমান হইয়া উঠিবে। সহস্র মানুষ এই পন্থা অবলম্বন করিয়া খোদার নিকট হইতে আলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা কত জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। মানুষ নিজে বুঝিতে ভুল করিতে পারে, কিন্তু খোদাতা'লা কখনও স্বীয় পথ প্রদর্শনে ভুল করিতে পারে না। নিজের সত্যতার প্রতি কত অটল বিশ্বাস সেই ব্যক্তির, যিনি নিজের দাবীর সত্যতা যাচাই করিবার জন্য লোকের সামনে এরূপ ঐশী পন্থা পেশ করেন।

কোন মিথ্যাবাদী কি ইহা বলিতে সাহস পাইবে যে, যাও স্বয়ং খোদার নিকট যাইয়া আমার সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর। কোন মিথ্যাবাদী কি ইহা কল্পনা করিতে পারে যে, মীমাংসার এরূপ পন্থা তাহার পক্ষে শুভ হইবে? যে ব্যক্তি খোদাতা'লার প্রেরিত না হইয়া মীমাংসার এই পন্থা মানিয়া লয় সে প্রকৃতপক্ষে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে ডিক্রী দেয় এবং নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করে। কিন্তু হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) সব সময় দুনিয়ার নিকট প্রকাশ করিয়াছেনঃ "আমার নিকট হাজার হাজার প্রমাণ আছে, কিন্তু যদি ইহাতে তোমরা সন্তুষ্ট হইতে না পার, তবে আমার কথা গ্রহণ করিও না, আমার বিরোধীদের কথাও গ্রহণ করিও না; খোদাতা'লার নিকট যাও এবং জিজ্ঞাসা কর যে, আমি সত্যবাদী কিনা। যদি খোদাতা'লা বলিয়া দেন যে, আমি মিথ্যাবাদী,তবে নিশ্চয় আমি মিথ্যাবাদী। কিন্তু যদি খোদাতা'লা বলিয়া দেন যে, আমি সত্যবাদী তবে আমার সত্যতা গ্রহণ করিতে তোমার আপত্তি কেন?"

হে আমার প্রিয়গণ! মীমাংসার জন্য ইহা কেমন সরল, সহজ ও সত্য পথ। হাজার হাজার মানুষ এই উপায়ে উপকৃত হইয়াছে এবং এখনও যাহারা উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে চাহে তাহারা উপকৃত হইতে পারে। মীমাংসার এই পদ্ধতির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে হিকমত ছিল যে, তিনি

পার্থিবতার উপর ধর্মকে প্রবল জানিতেন। তিনি বলিতেন, জড়বস্তু দেখিবার জন্য খোদাতা'লা আমাদিগকে চক্ষু দিয়াছেন, জড় বিষয় বুঝিবার জন্য বুদ্ধি দিয়াছেন। জড় পদার্থকে দৃশ্যমান করিবার জন্য সূর্য এবং অসংখ্য তারকারাজি সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, কিভাবে ইহা সম্ভব যে, আধ্যাত্মিক হেদায়াতের জন্য তিনি কোন ব্যবস্থা করিবেন না? নিশ্চয়, যে কোন সময় যে কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক বস্তু দেখিবার আকাঙ্খা প্রকাশ করিলে, তিনি তাহার জন্য উহার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং পবিত্র কুরআনে বলিতেছেনঃ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(সূরা আনকবুত 29 ঃ 70)

অর্থাৎ– যে কেহ আমাদের সহিত মিলিত হইবার বাসনা লইয়া পরিশ্রম সহকারে কাজ করে, আমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করি ।

মোট কথা এই যে, হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দানের ব্যবস্থা নিজ জামা'তের জন্য যেভাবে উন্মুক্ত করিয়াছেন, তেমনি বিরুদ্ধবাদীদের সম্মুখেও উপস্থিত করিয়াছেন। আমাদের খোদা চিরঞ্জীব। তিনি আজও বিশ্বের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বিধানের পরিচালনা করিতেছেন। বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ্ তা'লার সহিত উত্তরোত্তর অধিকতর সংযোগ স্থাপন করা এবং নৈকট্য লাভ করা অবশ্য কর্তব্য। যাহার নিকট এখনও আল্লাহ্ তা'লার হেদায়াত প্রকাশিত হয় নাই, তাহার কর্তব্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট জ্যোতিঃ প্রার্থনা করা এবং ঐ জ্যোতির সাহায্যে সত্যে উপনীত হইতে চেষ্টা করা। সুতরাং হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও দাবী হইল মানবের সংশোধন করা এবং মানব সমাজকে পুনরায় খোদাতা'লার দিকে লইয়া যাওয়া। তাঁহার দায়িত্ব হইল, যাহারা খোদাতা'লার সহিত মিলিত হওয়া সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছে, তাহাদের হৃদয়ে খোদা-মিলনের বিশ্বাস সৃষ্টি করা এবং ঐরূপ জীবনের সহিত মানুষকে পরিচিত করা যেরূপ জীবন মূসা (আঃ),ঈসা (আঃ) এবং অন্যান্য নবীদের সময়ের লোকেরা লাভ করিতে পারিয়াছিল।

হে প্রিয়গণ! প্রাচীন গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়া দেখ, পুনরায় নিজ পূর্ব-পুরুষদের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ। তাঁহাদের জীবন কি জড়বাদী ছিল? তাঁহাদের সকল কাজ কি শুধু জড় উপকরণ দ্বারা চলিত? তাঁহারা খোদাতা'লার নৈকট্য লাভের জন্য দিবা-রাত্রি চঞ্চল থাকিতেন। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা খোদাতা'লার মোজেযা এবং খোদাতা'লার নিদর্শনসমূহ লাভ করিতেন। ইহাই ছিল সেই মহিমান্বিত জীবন যাহার গৌরবে তাঁহারা অন্য জাতির ঊর্দ্ধে স্থান পাইয়াছিলেন। হিন্দু, খৃষ্টান এবং অপরাপর জাতির তুলনায় মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য কি? যদি কোন বৈশিষ্ট্য না থাকে, তবে ইসলামের প্রয়োজন কি? প্রকৃতপক্ষে বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু মুসলমানগণ তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। উক্ত বৈশিষ্ট্য হইল, একমাত্র ইসলামের জন্য খোদার বাণী সচল আছে এবং থাকবে। ইসলামের পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে খোদার সহিত সংযোগ স্থাপন করা যাইতে পারে। রসূলে করীম (সাঃ)-এর ফয়েজান বা কল্যাণের অর্থ ইহাই। তাঁহার কল্যাণের অর্থ ইহা নহে যে তুমি বি.এ, এম.এ পাশ কর। একজন খৃষ্টান কি বি.এ, এম.এ পাশ করে না? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কল্যাণের অর্থ ইহা নহে যে, তুমি এক বিরাট কারখানা চালাইয়া ধনশালী হও। খৃষ্টান, হিন্দু, শিখ কি কারখানা চালায় না? রসূল করীম (সাঃ)-এর কল্যাণের অর্থ ইহা নহে যে, তুমি এক বিরাট ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবে এবং বিদেশে দূর-দূরান্তে তোমার কারবার চলিবে। এই সমস্ত কাজ হিন্দু, খৃষ্টান এবং ইহুদীরাও করিতেছে। রসূল করীম (সাঃ)-এর কল্যাণের প্রকৃত অর্থ হইল, তাঁহার মাধ্যমে যেন খোদাতা'লার সহিত মানুষের সত্যিকার সংযোগ স্থাপিত হয়, মানব-হৃদয় আল্লাহ্ তা'লার দর্শন লাভ করে এবং তাহার আত্মা খোদাতা'লার সহিত মিলিত হয়। সে খোদাতা'লার সুমধুর বাণী শ্রবণ করে এবং খোদাতা'লার নিত্য নতুন নিদর্শনসমূহ তাহার স্বপক্ষে প্রকাশ পাইতে থাকে। ইহা সেই অমূল্য রত্ন যাহা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দাসত্ব না করিলে কেহ পাইতে পারে না। ইহা সেই বিষয় যদ্বারা মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর অনুসারীগণ অপর জাতিসমূহের উপর বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। সুতরাং হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মুসলমানদের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন; এবং উহাকেই

তিনি বিরুদ্ধবাদীদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বলিয়াছেনঃ “এই হারানো মুক্তা খোদাতা'লা আমাকে দিয়াছেন, এই বিনষ্ট সম্পদ আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রদান করিয়াছেন এবং এই সকল দানের সবকিছুই কেবল মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কল্যাণ এবং তাঁহার অনুবর্তিতার ফলে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার কল্যানেই আমি এই সম্মানের অধিকারী হইয়াছি।” হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এতদভিন্ন আরও বহুবিধ কাজ করিয়াছেন। কিন্তু সেগুলির গুরুত্ব আংশিক ও আপেক্ষিক। অবশ্যই, সেই কাজগুলিও বিরাট ও মহা গুরুত্বপূর্ণ। তথাপি, তাঁহার আসল কাজ ছিল **ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দান করা এবং পার্থিবতার উপর আধ্যাত্মিকতাকে প্রবল করার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করা**। অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের বিজয়ের ইহাই একমাত্র নিশ্চিত উপায়। অবশ্য তোপ, কামান দ্বারা আমরা নিজ দেশ রক্ষা করিব এবং কোন শত্রুকে ইহা দ্বারা দমনও করিব। কিন্তু ইসলামের যে বিজয় সারা বিশ্বব্যাপী আসিবে তাহা একমাত্র এই আধ্যাত্মিক উপায়েই আসিবে। ইহারই প্রতি হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। যখন মুসলমানগণ প্রকৃত মুসলমান হইবে, ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দান করিবে, যখন আধ্যাত্মিক বিষয়কে জাগতিক বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিবে, তখন এই বিলাসিতাপূর্ণ জীবন, যাহা পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে আমাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে, স্বাভাবিক ভাবেই দূর হইবে এবং লোকে কাহারো অনুরোধের অপেক্ষা না করিয়া নিজ তাকিদেই সকল অনাচার ত্যাগ করিয়া পবিত্র জীবন যাপন করিতে থাকিবে। তখন তাহার কথার প্রভাব সৃষ্টি হইবে এবং তাহার প্রতিবেশী তাহাকে অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিবে। খৃষ্টান, হিন্দু এবং অপরাপর ধর্মাবলম্বীগণ মক্কাবাসীগণের মতই বলিতে লাগিবেঃ

(সূরা হিজর 15 ঃ 3) لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ

অর্থাৎ- হায়! তাহারাও যদি মুসলমান হইত! এইরূপ বলিতে বলিতে, মক্কাবাসীদের ন্যায় তাহাদের কথা কার্যে পরিণত হইবে এবং কালক্রমে তাহারাও মুসলমান হইয়া যাইবে। কারণ উত্তম বিষয় হইতে দূরে অধিক

কাল কেহ থাকিতে পারে না। প্রথমে বিষয়টি ভাল লাগে, পরে উহা পাইতে লোভ হয়, তাহার পর পাইবার চেষ্টা আরম্ভ হয় এবং ক্রমবর্ধমান আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া শেষ পর্যন্ত উহার সহিত মিলিত হয়। এখনও এইরূপই হইবে। প্রথমে ইসলাম মুসলমানগণের অন্তরে প্রবেশ করিবে, পরে তাহাদের শরীরে চালিত হইবে। তখন অমুসলমানগণ এইরূপ খাঁটি মুসলমানদের নকল করিতে আরম্ভ করিবে এবং সকল পৃথিবী মুসলমান দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে এবং ইসলামের আলোকচ্ছটায় জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

হে আমার প্রিয়গণ! এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি বিস্তারিত দলীলসমূহ বর্ণনা করিতে পারিতেছি না এবং আহ্‌মদীয়াতের বাণীর সকল বিষয় আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে পারিতেছি না। আমি সাধারণভাবে আহ্‌মদীয়াতের উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিলাম এবং আপনাদের নিকট আমার অনুরোধ, আপনারা এই প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু গভীরভাবে চিন্তা করুন এবং বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, পৃথিবীতে ধর্মীয় আন্দোলন কখনও শুধু পার্থিব উপায়ে জয়যুক্ত হয় নাই। ধর্মীয় আন্দোলন আত্মশুদ্ধি, প্রচার এবং আত্ম-ত্যাগ দ্বারাই সর্বদা জয়যুক্ত হইয়াছে। আদম (আঃ)-এর সময় হইতে আজ পর্যন্ত যাহা হয় নাই তাহা এখনও হইবে না। যে ধারায় খোদাতা'লার বাণী আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করিয়া আসিয়াছে, সেই ধারাতেই এখনও মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পয়গাম (আহ্বান) দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করিবে। সুতরাং নিজ আত্মার প্রতি, নিজ সন্তানের প্রতি, নিজ পরিবার এবং নিজ জাতির প্রতি এবং নিজ দেশের প্রতি কৃপা করিয়া খোদাতা'লার পয়গাম শুনিতে এবং বুঝিতে চেষ্টা কর, যেন আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণের দ্বার অতি শীঘ্র তোমাদের জন্য উন্মুক্ত হইয়া যায় এবং ইসলামের উন্নতি পিছাইয়া না পড়ে। আমাদের সম্মুখেও বহু কাজ পড়িয়া আছে। সেজন্য হে পথিক! আমরা আপনার আগমনের আশায় অপেক্ষা করিতেছি। কারণ ঐশ্বরীক উন্নতি মোজেযা ছাড়া ধর্ম-প্রচারের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখে। আসুন আমরা একসঙ্গে মিলিত হইয়া এই প্রচারের দায়িত্ব পালন করি। কারণ ইসলামের উন্নতির এই দায়িত্ব পালন করা একান্ত কর্তব্য। এই পথে আত্ম-ত্যাগ করিতে হইবে।

গ্লানি, নিন্দা, অত্যাচার অবশ্য সহ্য করিতে হইবে। **খোদার রাস্তায় মৃত্যু বরণ করাতেই প্রকৃত জীবন লাভ হয়।** এই মৃত্যুবরণ না করিলে কেহ খোদাতা'লার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। এই মৃত্যুকে বরণ না করিলে ইসলামও জয়যুক্ত হইতে পারিবে না। সাহস সঞ্চয় করুন, মৃত্যুর এই পেয়ালা মুখে তুলিয়া ধরুন যেন আমাদের ও আপনার মৃত্যুতে ইসলাম জীবনপ্রাপ্ত হয় এবং মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ধর্ম নতুন জীবন লাভ করে এবং এই মৃত্যুকে বরণ করিয়া যেন আমরা আমাদের প্রেমাস্পদের সান্নিধ্য লাভ করিয়া অনন্ত জীবন লাভে ধন্য হই। হে আল্লাহ্! আমাদের প্রার্থনা কবুল কর। আল্লাহুম্মা আমিন।

খাকসার
মির্যা মাহমুদ আহমদ
ইমাম জামাত আহমদীয়া
২৭ অক্টোবর ১৯৪৮
(আল ফযল ৬ই নভেম্বর ১৯৪৮)